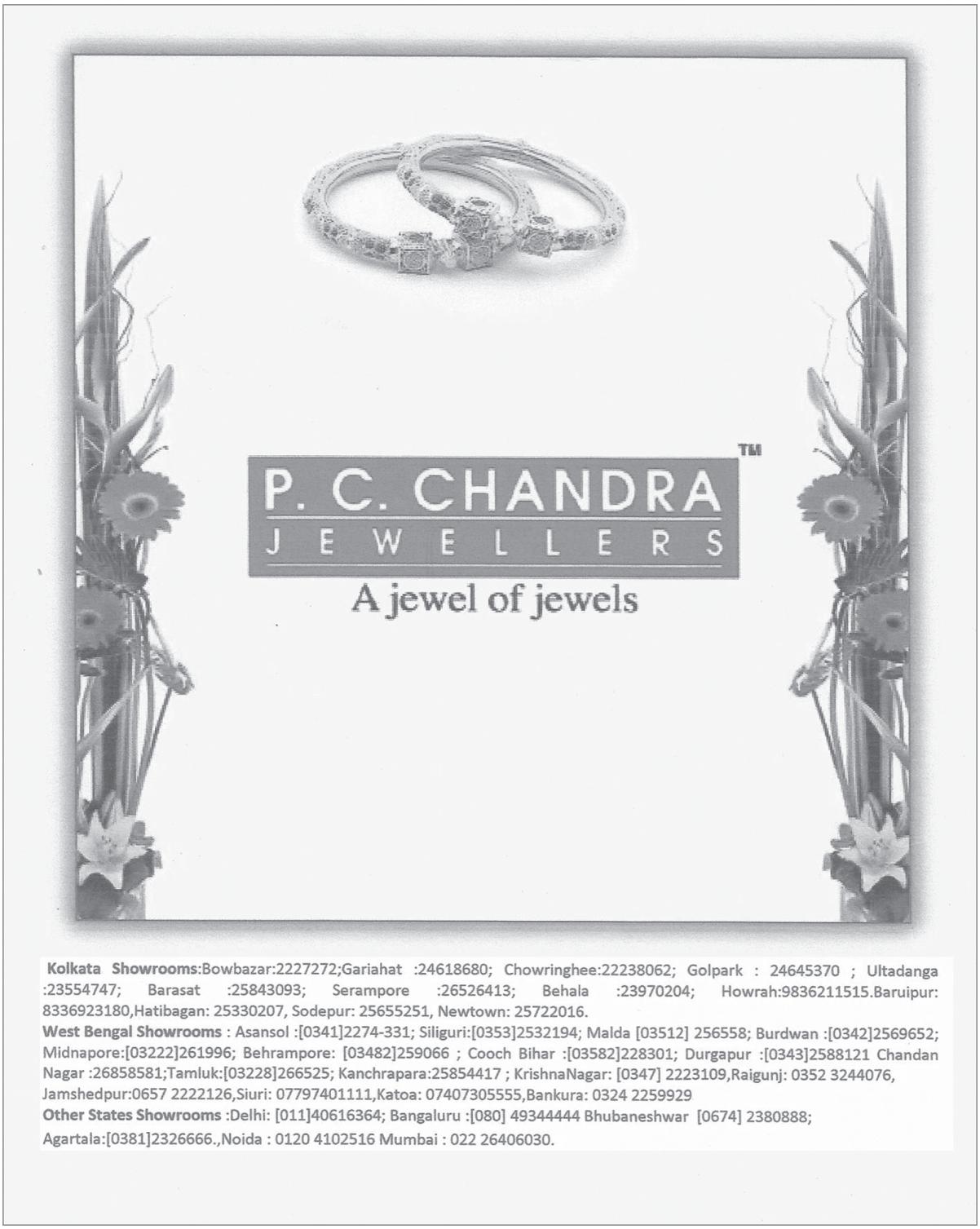

Kolkata Showrooms:Bowbazar:2227272;Gariahat :24618680; Chowringhee:22238062; Golpark : 24645370 ; Ultadanga :23554747; Barasat :25843093; Serampore :26526413; Behala :23970204; Howrah:9836211515.Baruipur: 8336923180,Hatibagan: 25330207, Sodepur: 25655251, Newtown: 25722016.

West Bengal Showrooms : Asansol :[0341]2274-331; Siliguri:[0353]2532194; Malda [03512] 256558; Burdwan :[0342]2569652; Midnapore:[03222]261996; Behrampore: [03482]259066 ; Cooch Bihar :[03582]228301; Durgapur :[0343]2588121 Chandan Nagar :26858581;Tamluk:[03228]266525; Kanchrapara:25854417 ; KrishnaNagar: [0347] 2223109,Raigunj: 0352 3244076, Jamshedpur:0657 2222126,Siuri: 07797401111,Katoa: 07407305555,Bankura: 0324 2259929

Other States Showrooms :Delhi: [011]40616364; Bangaluru :[080] 49344444 Bhubaneshwar [0674] 2380888; Agartala:[0381]2326666.,Noida : 0120 4102516 Mumbai : 022 26406030.

উপন্যাস

শিরিণ

সুমিত্রা ঘোষ

‘শিরিণ! হোয়াট ডু ইউ থিংক ইউ আর ডুইং? এ্যাঁ! ইউ আর প্লেয়িং মার্বল হিয়ার?দিস ইজ দ্যা থার্ড টাইম ইউ হ্যাভ বাঙ্কড্ স্কুল দিস উইক। ইটস্ ভেরি আনফেয়ার অ্যান্ড ব্যাড ফর মি, ফর ইওর মম্ অ্যান্ড ফর ইওরসেল্ফ টু-উ বেবি! লুক! ইউ হ্যাভ মেড ইওর স্কুল ইউনিফর্ম, ব্যাগ, এভরিথিং সো ডার্টি! ও মাই গড্ হোয়াই কান্ট আই মেক দ্যা চাইল্ড আন্ডার স্ট্যান্ড দ্যাট সি বিলংগস টু, আ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড টু লিভ ইন? সি ইজ নট ওয়ান অফ দেম! সি ইজ নট আ হাউসমেইডস্ চাইল্ড! ও গড্ হেল্প মি প্লিজ...! কম অন্ শিরিণ লেটস্ গো হোম। গেট আপ আই সে।’

যাকে উদ্দেশ্য করে মিস অ্যানি গোমস-য়ের হা-হুতাশ করে এত কথা বলা, সে এসব শুনল বলে মনে হয় না। সে তখন মাটিতে হাঁটুমুড়ে বসে মার্বেলের গুলিতে ডান্ডা লাগিয়ে নিশানা তাক করার কাজে ব্যস্ত। স্কুল ব্যাগটা অবহেলায় মাটিতে পড়ে আছে। এখানটায় ঘাস নেই বলে খেলুড়েদের পায়ে পায়ে ওড়া ধুলোর আস্তরণে ব্যাগটার চেহারা পাল্টে গেছে। অ্যানি নীচু হয়ে ব্যাগটা তুলে পরনের কাপড় দিয়ে ধুলো ঝাড়লেন, তারপর শিরিণের হাত ধরে টানলেন— 'উঠো ঘর চলো।' — হাত ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টার পর গোমড়া মুখে উঠে দাঁড়ালো শিরিণ। করুণ মিনতির গলায় বলল, 'এ্যাম সরি ম্যাডাম। আই প্রমিস নেকস্ট উইক আই উইল নট বাঙ্ক স্কুল ফর আ সিঙ্গল ডে।... বাট দিস ওয়াজ আওয়ার লাস্ট গেম অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মাই লাস্ট শট্ ইউ ইনটারাপ্টেড। আই লস্ট অল দ্যা গেমস্ সিন্স মর্নিং... আ-আই জাস্ট স্টার্টেড উইনিং দ্যা লাস্ট গেম হোয়েন ইউ অ্যারাইভড.... উড ইউ প্লিজ এ্যালাউ মি টু প্লে দ্যা লাস্ট শট্.. প্লীজ অ্যানি ম্যাডাম...'

অ্যানির নরম মনে এই ন'বছরের মেয়ের জন্য অপত্য স্নেহের ভাণ্ডার। বললেন, 'ওকে, ইউ উইল নট গেট এনিমোর চান্সেস আফটার দিস শট্। লুজ অর উইন ইউ আর গোয়িং ব্যাক হোম।'— আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে শিরিণ বলেছিল— 'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।'— সারা সকাল হারার পর ভরদুপুর সেই লাস্ট গেমটা শিরিণ জিতে গিয়েছিল। কথায় বা ফেশিএ্যাল ল্যাংগোয়েজে প্রকাশ না করলেও অ্যানি খুব খুশি হয়েছিলেন। হোক না ডান্ডাগুলি, থাকুক না খেলুড়েদের মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান, খেলা তো খেলাই। হার-জিতের দ্বারাই যার মূল্যায়ন হয়ে থাকে। শিরিণ বারবার হেরেও ধৈর্য হারায়নি, তাই লাস্ট গেমটা জিতে আসতে পেরেছে। ধৈর্য ধরে রাখাটাই ওর প্লাস পয়েন্ট। বিশেষত ওর মতো একজন প্রবলেম চাইল্ডের ক্ষেত্রে ধৈর্যই যে একমাত্র ওষুধ, একমাত্র ভরসা। শিরিণের হাত ধরে ২৭ নং জাভেরি ভিলার দিকে চলতে চলতে অ্যানি প্রার্থনা করতে থাকেন— হে প্রভু, তুমি সারাজীবন শিরিণের পাশে থেকো, জীবনের খেলাতেও যেন ও ধৈর্য ধরে শেষ অবধি খেলতে পারে। হেরে গেলেও নতুন উদ্যমে আবার শুরু করে আজকের মতোই যেন জেতার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আমার জীবন, মিস্টার, মিসেস জাভেরির জীবন। ওদের একমাত্র সন্তান 'প্রেশাস ডায়মন্ড' এই শিরিণের জীবন — সবই তোমার হাতের লিখন প্রভু! আমরা সবাই তোমার লেখা 'প্লে'-তে তোমার ইচ্ছেমতো অভিনয় করে চলেছি মাত্র। আমাদের কৃতকর্ম, পাপ-পুণ্য এই সমস্ত কিছু তুমি তোমার মর্জিমাফিক সৃষ্টি করেছ। তাহলে আমরা কেন এত কষ্ট পাই প্রভু? তিনমাস বয়স থেকে শিরিণকে আমি লালন করেছি। ও যতখানি ওর গর্ভধারিণী মা মিসেস জাভেরির সন্তান ততখানিই আমারও সন্তান হয়ে উঠেছে তুমি জানো। ও আমাকে খুব সম্মান করে, কিন্তু মা বলে তো ভাবে না! ওর মাননীয় গভর্নেস বলেই ভাবে। ওর শিশুমন সারাক্ষণ মাকে কাছে পেতে চায়, বাবাকে পেতে চায়, কিন্তু তোমার ভাগ্য লিখনের কারণে ও ওদের কাউকে কাছে পায় না সবসময়। এটাই ওর প্রবলেম আর এই প্রবলেমই ওকে স্কুলের প্রতি, পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহী করে তুলছে। ওর মন আমি বুঝি। বাবার জন্য অত নয়, কারণ ও বোঝে বাবা দূরে কোনো না কোনো সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে আছে। সেখান থেকে যখন ইচ্ছে চলে আসা সম্ভব নয়। ওর অভিমান মা-র ওপর। মা কাছে থেকেও মা-র সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত শিরিণ ধীর ধীরে মাতৃ বিদ্বেষী হয়ে উঠছে। এই বিদ্বেষ যেন কখনও প্রতিহিংসায় পরিণত না হয়। একশো পার্সেন্ট মানুষই অক্লান্ত পরিশ্রম লব্ধ নাম-যশ-খ্যাতির মোহ ত্যাগ করতে পারে না, মিসেস জাভেরিও পারছেন না। আমি সাক্ষী আছি, আমি জানি উনি ওঁর মেয়েকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন। মেয়েকে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না বলে কত চোখের জল ফেলেন। নিজেকে নিজেই কশাঘাত করেন, অপরাধী বলে ভাবেন। সকালে বেরিয়ে যাবার আগে যতখানি সম্ভব সময় মেয়ের সঙ্গে কাটান। রাত্রে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়, কিন্তু ফিরে এসে আগে মেয়ের রুমে যান। ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করেন। অনেকক্ষণ চুপ করে ওর বিছানায় বসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর পোশাক বদলান, স্নান করেন। নিজের বাড়িতে একমাত্র ব্রেকফাস্ট ছাড়া লাঞ্চ-ডিনার খাওয়া ওঁর কপালে জোটে খুব কম। মিস্টার জাভেরি ছুটিতে এলে মিসেস জাভেরি বেশ কয়েকদিনের ছুটি নেন। ডাইরেক্টরের সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করার সময় এই শর্ত লিখিতভাবে করা হয়। তখন এই বাংলোটাও, নেবারহুডের অন্য সব বাংলোর মতো 'পরিবার' হয়ে ওঠে। সুখের সুমধুর বাতাস বইতে থাকে বাড়ি জুড়ে। তখন বোঝা যায় এই স্বামী-স্ত্রী জুটির মধ্যে একে অন্যকে ছেড়ে থাকার পেছনে কতখানি সমঝোতা, কত গভীর বিশ্বাস নীরবে কাজ করে চলেছে। অনেক সময় ওদের দুজনের ভালবাসার

ছোট ছোট চিত্র অ্যানির নজরে পড়েছে ওদের অজান্তে। অ্যানি এত বছর ধরে এই কাপল্‌কে দেখে দেখে বুঝতে পেরেছেন ওদের ভালবাসার ভিত এত মজবুত যে এ জীবনে কেন আগামী কয়েক জীবনেও কোনো ভূমিকম্প এই ভিত ভাঙতে পারবে না। সারাদিন শুধু শিরিণ শিরিণ আর শিরিণ। শিরিণকে ঘিরেই সবকিছু আর তারই মধ্যে নিজেদের ভালবাসার কতরকম অভিব্যক্তির প্রকাশ। সারা বছর ধরে শিরিণের সমস্ত ইচ্ছের অপূর্ণতা ওরা যেন একইদিনে পূর্ণ করে দিয়ে ধন্য হতে চায়। বৃত্তের কেন্দ্রে বিন্দুর মতো শিরিণকে ঘিরে ঘুরছে ওদের দুজনের জীবনের পেন্ডুলাম। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ড্যাড্ বাড়ি এলে শিরিণ মেইড সার্ভেন্টদের ছেলেমেয়ে অর্থাৎ ওর বন্ধুদের সঙ্গে ডান্ডাগুলি খেলতে যায় না মোটেই। স্কুলে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মম্-ড্যাডের সঙ্গে লেপ্টে থাকে, স্কুল থেকে ফিরে অন্য সব বাচ্চাদের মতো স্কুলের গল্প শোনায় মম্-ড্যাডকে। শিরিণ একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করে। ওর মধ্যে যে মানসিক যন্ত্রণা আছে সেটা তখন এতটুকুও প্রকাশিত হয় না। বাবা-মার সান্নিধ্য, ওদের আদর মহৌষধের মতো কাজ করে। ছুটিতে সাইরাস ফিরোজ জাভেরির বাড়িতে আসা যেন দীর্ঘ খরার দাবদাহের পর প্রবল বর্ষণে জ্বালা প্রশমিত হওয়ার মতো শান্তি বলে মনে হয় মিস অ্যানি গোমস্‌য়ের।

ন'বছর আগে এই বাড়িতে গভর্নেসের কাজ পেয়ে এসেছিলেন। এসে দেখে অবাক হয়েছিলেন, কার গভর্নেস হবেন তিনি? যার গভর্নেস বলে সম্মানজনক পদে গৃহকর্ত্রী তাকে নিযুক্ত করলেন সে তখন ক্র্যাডেলে শোওয়া তিনমাসের এক শিশুকন্যা। দেবাঙ্গনা জাভেরির অকপট স্বীকারোক্তি, ওঁর কল্পনাতীত মার্জিত ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারেননি অ্যানি। দেবাঙ্গনা যে বলিউডের এক নামকরা অভিনেত্রী একথা জানা ছিল না তাঁর। কেরলের মেয়ে, হিন্দী ভাষা জানতেন না, হিন্দী সিনেমা দেখেনওনি কখনও। অরফ্যানেজে বড় হতে হতে মিশনারি সিস্টারদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ইংরেজি ভাষাই মাতৃভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেরলের ভাষাটা স্বাভাবিক কারণে সব অরফ্যানরাই রপ্ত করে ফেলত স্থানীয় আয়া-আম্মাদের সঙ্গে মিশে ওদের সঙ্গে জ্ঞান হবার পর থেকে কথা বলে বলে। রোমান ক্যাথলিক মিশনারি সিস্টারদের প্রবল সংস্কার এবং কঠিন অনুশাসনের নিগড়ে বাঁধা জীবনে চলচ্চিত্র নামের মনোরঞ্জনের স্থান ছিল না। কমিউনিটি হলে অ্যানিরা কখনো-সখনো মুভি দেখেছেন কিন্তু সেগুলো হয় ডকুমেন্টারি মুভি নয়ত ধর্মীয় অথবা আদর্শমূলক। প্রথমদিন ইন্টারভিউয়ের সময় সামনে বসে থাকা অপরূপ সুন্দরী মহিলা বম্বে ফিল্ময়ের একজন উজ্জ্বল তারকা একথা জেনে অ্যানি শুধু বিস্মিত হননি, ওর মনে যথেষ্ট কৌতূহল জেগেছিল। এতকাল জানতেন কমার্শিয়াল মুভির চিত্র তারকারা আকাশের তারার মতোই নাগালের বাইরে থাকেন। পর্দায় কিংবা পত্র-পত্রিকার পাতায় তাদের ছবি দেখা যায়, এই পর্যন্তই। সেই নাগালের বাইরের আকাশের তারা একেবারে অ্যানির উল্টোদিকে সুসজ্জিত ড্রইং হলে মূল্যবান সোফায় বসে অ্যানিকেই বিনীতভাবে নিজের জীবনের কথা অকপটে বলছিলেন— 'আমি ঠিক আপনার মতো একজনকেই আমার মেয়ের দায়িত্ব দেবার জন্য খুঁজছিলাম মিস গোমস্। আপনি একজন অরফ্যান, আর আমি? জানেন, আমার মা-বাবা থাকা সত্ত্বেও আমিও একজন অরফ্যান। ভালবেসে পার্শী ছেলে সাইরাসকে বিয়ে করার অপরাধে আমার বাঙালি ব্রাহ্মণ বাবা-মা আমাকে আইনত ত্যাগ করেছেন। আর এখন আমার তিনমাসের মেয়েটাও প্রায় অনাথ হবার মুখে। প্রেগন্যান্সির ছ'মাস কাল থেকে আমি শ্যুটিং করতে পারিনি। তিন-চারটে মুভি আমার জন্য মাঝপথে আটকে রয়েছে। যখন কনট্র্যাক্ট সাইন করেছিলাম তখন জানতাম না যে কনসিভ করব। প্রথম পাঁচ মাস ড্যান্স সিকোয়েন্স ছাড়া অন্য দৃশ্যগুলোর শ্যুটিং করতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সিক্স মানথ্ চালু হতেই টামি বড় হয়ে গেল। ডাইরেক্টররা নিজেরাই আমাকে লম্বা মেটারনিটি লিভ দিলেন, সেই লিভ শেষ হতে চলেছে। আমার হাজব্যান্ড একজন নাবিক। সাইরাস কমার্শিয়াল নেভিতে আছে। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা নামকরা মার্চেন্ট শিপিং কোম্পানির জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমার অ্যাকটিং ক্যারিয়ারটাকে বাঁচানোর জন্য ও চাকরি ছেড়ে মেয়েকে দেখাশোনা করার জন্য চলে আসতে চায়। ও বলে, দেবাঙ্গনা তুমি আমার জন্য তোমার ফ্যামিলি স্যাক্রিফাইস করেছ, আমি তোমাকে আর কিছু স্যাক্রিফাইস করতে দেব না। মেয়েকে বড় করার জন্য আমি চাকরি ছেড়ে দেব।— আপনিই বলুন মিস গোমস্, আমরা ইন্ডিয়ান মেয়েরা কি এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারি?... আমি দুটো নৌকায় দু-পা রেখে নদীর ওপর আছি। অর্ধেকের বেশি তৈরি হয়ে যাওয়া মুভিগুলো এখন ছেড়ে দিলে প্রোডিউসার আমাকে ব্রীচ অফ কনট্র্যাক্টয়ের দায় এবং ওনার প্রভূত লোকসানের দায়ে

কোর্টে যাবেন। আমার সাজা হবেই। অন্যদিকে সাইরাসের প্রস্তাবে সম্মত হলে এত অল্প বয়সেই আমি ওর ক্যারিয়ারটাকে শেষ করে দেব। জাহাজ ওর ঘরবাড়ি, সমুদ্র ওর জীবন! — এক মারাত্মক দোলাচলে দুলতে দুলতে অবশেষে আমি খৃশ্চিয়ান অরফ্যানেজগুলোকে শর্টলিস্ট করে ওদের সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লিখি। আমি জানতাম, সেবা ওদের ধর্ম, ওরা নিজের রেসপনসিবিলিটি থেকে কখনও বিচ্যুত হয় না। নিউজ পেপারে অ্যাড দিলে গভর্নেস পাবো, কিন্তু ওদের হাতে ভরসা করে মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারব না। তাই অরফ্যানেজের দ্বারস্থ হওয়া। ... কয়েক জায়গা থেকেই রেসপন্স এসেছে, তার মধ্যে আপনাদের সিস্টার র‍্যাচেলের চিঠি আমার মর্মস্পর্শ করেছে। উনি চিঠিতে ক্যান্ডিডেট মিস অ্যানি গোমস্‌য়ের সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটা পড়েই আমার মনে হয়েছে— একেই তো আমি আমার মেয়ের জন্য খুঁজে চলেছি। ... আপনি যে এসেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ মিস গোমস!' — একটানা দেবাঙ্গনা জাভেরি এত কথা বলে অবশেষে থেমেছিলেন।

অ্যানি নীরবে শুনেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন এই তরুণী অভিনেত্রী এতক্ষণ ধরে যা বলল, তাতে এক ছিটেফোঁটা অভিনয়ের লেশমাত্র ছিল না। নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষটি একা একা সমস্যাগুলো সলভ্ করতেও পারছিল না, কাউকে বলতেও পারছিল না। আজ তাকে কাছে পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে অ্যানি অনেকগুলো জায়গায় কাজ করেছেন এবং আত্মসম্মানে আঘাত করার কারণে ছেড়ে দিয়ে সিস্টারদের কাছে অরফ্যানেজে ফিরে গেছেন বারবার। নানারকম মানুষের পরিবারে থাকার ফলে ওর অভিজ্ঞতার পুঁজি যথেষ্ট ভারি হয়েছে। দেখেছেন, 'গভর্নেস' শব্দটার অর্থ না জেনে টাকার গরমে সোশ্যাল স্ট্যাটাস বাড়াবার জন্য অনেকে বাচ্চাদের গভর্নেস রেখে ফেলে গভর্নেসকে বাড়ির ঝি-চাকরের সমতুল বলে মনে করে। মিসেস জাভেরিই অ্যানির দেখা প্রথম এমপ্লয়ার যিনি গভর্নেস-এর মানে জানেন, তার মর্যাদা দিতে জানেন। সারা অঙ্গে কোনো সজ্জা নেই, মেকআপ নেই, একেবারে ঘরোয়া পোশাকে পিঠে-বুকে দীর্ঘ কালো একরাশ খোলা চুল ছড়িয়ে কমনীয়তা মাখানো অপূর্ব সুন্দর মুখখানা নিয়ে যে নারী তার সামনে বসে আছে সে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, জলের মতো সহজ— এই নারীকে বুঝতে পারা যায়, কারণ ইনি অবোধ্য নন। অ্যানি ওঁর কাছে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন, কিন্তু উনি অ্যানিকে প্রশ্নজালে বদ্ধ করলেনই না, বরং উনি যেন অ্যানির কাছে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন— সেরকম ভাবেই কথা বললেন। ওর কথা বলার ধরনটাও সুন্দর, মার্জিত শুধু নয়, অত্যন্ত বিনীত। অসম্ভব এ্যাপিলিং ওঁর অ্যাপ্রোচ, যা মুহূর্তে অন্য মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে, দূরকে নিকট, পরকে আপন করতে পারে। অভিভূত অ্যানি গোমসের অন্তরাত্মা বলতে লাগল, 'গড তোমার জন্য একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন অ্যানি, এমন দরজা বারবার খুলবে না জীবনে। নিঃসংকোচে নিঃসন্দেহে তুমি এই বাড়ানো হাতখানা ধর, সারা জীবনের মতো তুমি এই বাড়িতে পরিবারের একজন হয়ে থাকতে পারবে সসম্মানে।'

অ্যানি নিজের অন্তরাত্মার আওয়াজ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। মেয়ে বড় হলে তখন গভর্নেস হবেন এখন তাকে মেয়ের মা হতে পারে। মিসেস জাভেরি শুধু মেয়েকে ওঁর হাতে তুলে দিলেন তাই নয়, অল্পদিনের মধ্যেই পুরো সংসারের ভারও ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে ওঁকে জাভেরি পরিবারের অন্যতম মেম্বারের সম্মান দিলেন। শিরিণ ন'বছরের হয়েছে, ওঁর হাতে, আর এই ন'বছরের মধ্যে অ্যানিকে কেরলের অনাথ আশ্রমে ফিরে যেতে হয়নি চাকরি ছেড়ে। বোম্বের বান্দ্রা অঞ্চলের এক সাইড রোড দিয়ে দু-কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে এসে দুশো বছরের পুরনো কোলাহলমুক্ত, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন অ্যাবসোলিউট পার্শী কমপ্লেক্সের ২৭ নম্বর বাংলো 'জাভেরি ভিলা' ওর পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস হয়ে গেছে। অ্যানি সন্ন্যাসিনী হতে চাননি, তিনি সংসারী হতে চেয়েছিলেন। কম বয়সে ভুলে যেতেন তিনি অরফ্যানেজের করুণায় পালিত হচ্ছেন, নিজের কুলপরিচয়ই জানেন না। স্বপ্ন দেখার সেই বয়সে সুখ-দুঃখ মেলানো মেশানো প্রিয়তম স্বামী-সন্তান সহ এক সাধারণ সংসার বারবার কল্পনার, জানালা দিয়ে মনে উঁকি মারত। কল্পনায় দেখা একান্ত নিজস্ব সংসারের ছবিটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কল্পলোকে কখন যে হারিয়ে গেছে মনে নেই। ঈশ্বর সত্যিই করুণাময় তাই কয়েকবার এখানে ওখানে ঠোক্কর খাইয়ে সংসারের কদর্য রূপ দেখিয়ে অবশেষে ওকে জাভেরি পরিবারে এনে পাকাপাকি নোঙর করিয়ে দিয়েছেন। নিজস্ব না হলেও সাইরাস দেবাঙ্গনার সুখের সংসারে স্বমর্যাদায় থাকতে পেরে তিনি ধন্য হয়েছেন বলে মনে করেন। অপরদিকে সাইরাস-দেবাঙ্গনা ওঁর মতো

মাতৃতুল্য মহিলাকে পেয়েছে বলে নিজেদের ধন্য বলে ভাবে। সাইরাস নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ায় আর ডাঙায় পা রেখেই লং ডিসট্যান্স কল করে অ্যানির কাছ থেকেই সব খবর জানতে চায়। তখনও এদেশে মোবাইল ফোন চালু হয়নি যে মিসেস জাভেরিকে স্টুডিওতে ফোন করবে। বলত, হাই মিস গোমস! গুড আফটারনুন! হাও আর ইউ? অ্যানি বলতেন, গুড মর্নিং মি: জাভেরি! হিয়ার ইট ইজ নট আফটারনুন স্যার, মর্নিং এইট পাস্ট টোয়েন্টি। হোয়ার আর ইউ কলিং ফ্রম? উই আর অল ইন গুড হেলথ এ্যান্ড শেপ। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাটঅল! শিরিণ মিসেস জাভেরি অ্যান্ড মি, অল আর ইন রাইট ব্যালেন্স স্যার! হাউ আর ইউ?

— আই এ্যাম অলসো ফাইন অ্যান্ড ইন গুড স্পিরিট। আফটার ডকিং ইন ম্যাঞ্চেস্টার। মাই শিপ উইল বি হিয়ার ফর টেন ডেজ— আই উড বি এবল টু স্পিক টু মাই ফ্যামিলি ফর টেন ডেজ নাউ অনওয়ার্ডস।

— দ্যাটস্ আ গুড নিউজ। মিসেস জাভেরি অ্যান্ড শিরিণ উইল বি সো হ্যাপি... শিরিণ ইটস্ ইওর ড্যাড! কম্ অন্ স্পিক উইথ হিম! — ছোট্ট পুতুলের মতো মেয়ে ছুটে এসে কথা বলত— এ্যালো দ্যাদ্! আও আল য়্যু! — অ্যানি রিসিভারটা ধরে থাকতেন পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট।

ওরা ছাড়া অ্যানি গোমসয়ের আর তো কোনো আপনজন ছিল না! গড-এর কাছে আর কার জন্য প্রে করবেন উনি? একই বেডরুমে আলাদা দুটো খাটে শিরিণ আর উনি শোন এখনও। সেই রুমের এক কোণায় ছোট একটা টেবিল পেতে ওর 'অলটার'। প্রভু জিশাসের বাঁধানো ছবি আর ক্রস অলটারের ওপরে দেওয়ালের পেরেক থেকে ঝোলানো। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে একটা করে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন অ্যানি— হে প্রভু শিরিণের কল্যাণ করো। ওর মতিগতি ফেরাও। পড়াশোনায় মনযোগ এনে দাও প্রভু! তুমি অন্তর্যামী, তুমি জানো শিরিণ ওর বাবা-মার মতই ভাল একটা মেয়ে। হাজারবার দেখেছি আমি, অন্যায় করে বকুনি খাবার কারণ থাকলেও কখনো মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে না, সত্যি কথা বলে। মাত্র ন'বছর বয়সের অপাপবিদ্ধ শিশুর মন থেকে মায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভার দূর করো প্রভু। ওর মা নিজে কত ভাল, কত উদার মনের মানুষ সে তো তুমি জানো, তা না হলে ওদের বাড়িতে আমাকে তোমার উপাসনা করার অধিকার দিত? শিরিণ প্রায় আমার নাতনিসম, ওকে রক্ষা করো। বিপথে যেতে দিও না। সাইরাসকে সমুদ্রে নির্বিঘ্নে রেখো, দেবাঙ্গনার যশ-খ্যাতি বজায় রেখো। হে করুণাময় তোমার করুণায় জাভেরিদের শ্রীবৃদ্ধি হোক এই আমার প্রার্থনা।

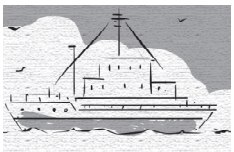

'প্যাক আপ'— অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টার মনোজ রানাডে শ্যুটিং বন্ধ করে দিলেন। স্টুডিওর সেটে শ্যুটিং হচ্ছিল সকাল এগারোটা থেকে। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম, চারদিকে অজস্র লাইট আর মেকআপের পলেস্তারায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা অ্যাকটর-কলাকুশলী সকলেরই। এরই মধ্যে স্বয়ং ডাইরেক্টার হঠাৎ বমি করতে শুরু করলেন। পনেরো মিনিটে বেশ কয়েকবার ভমিটিং আর দু'বার ওয়াটারি লুজমোশন হতেই উদয়ভানু কৌশলকে কাছাকাছি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে চলে এলো ওরা। গ্যাসট্রো এ্যানটাইটিস। উদয় ভাইজীর ওয়াইফ এসে না পৌঁছানো অব্দি দেবাঙ্গনা চলে আসতে পারে না, তাই থেকে গিয়েছিল হাসপাতালে। ডাক্তার বলেছেন, পেটে ইনফেকশন হয়েছে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড গরম মিলিয়ে ডিহাইড্রেশন হয়েছে উদয়ভানুর। ভয় পাবার কারণ নেই। আপাতত পাঁচদিন তো হাসপাতালে থাকতে হবেই, তারপর দুর্বলতা কাটানোর জন্য মিনিমাম দশদিন কমপ্লিট রেস্টে থাকতে হবে। তার মানে পনেরো দিনের জন্য এই ছবির শ্যুটিং পেনডিং হলো। এই সময় ওর হাতে এই ছবিটা ছাড়া আর ছবি নেই। তাই এই পনেরো দিন নিরবচ্ছিন্ন ছুটি। মনোজ রানাডে বলে দিয়েছেন, উদয় কৌশল সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর শ্যুটিং কবে আবার আরম্ভ হবে ফোনে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

উদয়জীর স্ত্রী মালিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে চোখ বন্ধ করে বাতানুকূল শীতলতায় বসে ভাবছিল দেবাঙ্গনা। এখন বেলা মাত্র সাড়ে তিনটে। কয়েক বছর আগেও এই সময়ে বাড়ি ফেরার কথা কল্পনাও করতে পারত না। একসঙ্গে চার-পাঁচটা ছবির শ্যুটিং চলত, কোনওটা স্টুডিও ফ্লোরের সেটে তো কোনওটা অন্য লোকেশনে। ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ির অন্ত ছিল না। বোম্বে ফিল্মের প্রথম সারির অভিনেত্রীকে ক্লান্তি, শ্রান্তির পরোয়া

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013

e-mail : t.c.india@vsnl.net

Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

A Well Wisher

K. M. AGARWAL

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor, Kolkata-700 007

((s) 2272-5487

Mob : 9331105467

৫ বছরের
গ্যারান্টী

ISI-2347

নির্মাতা

KUMAR PLASTICS PVT. LTD.

১৯২, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২২২১-১৯৫১, ২২৪২-১৯৩০, ২২৪২-৫৪১০

করা মানায় না। একের পর এক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত, দেশে বিদেশে দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত, লক্ষ লক্ষ ফ্যানের বন্দনা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পিঠের ব্যথা হজম করে হাসিল করতে হয়েছে। শুধু অভিনয় প্রতিভা থাকলেই স্টার হওয়া যায় না, প্রতিভা স্ফূরণের জন্য কঠোর তপস্যার মতো কঠোর পরিশ্রমও করতে হয়, তবেই সাফল্য আসে। ও করেছে। প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র মেয়েকে তিন মাস বয়স থেকে মিস গোমস্-য়ের তত্ত্বাবধানে রেখে আসতে দ্বিধা করেনি। শিরিণ তখন ব্রেস্টফীড করত। সারাদিন-রাত মেয়েকে দুধ খাওয়াতে পারত না। জমে যাওয়া দুধের মারাত্মক যন্ত্রণা দাঁত চেপে সহ্য করে মুখে হাসি বজায় রেখে ও. কে. শট দিয়েই ওয়াশরুমে দৌড়েছে। লেডি ডক্টরের দেওয়া সাকশন হ্যান্ডপাম্প দিয়ে বুকের দুধ বেসিনে কলের জল আর চোখের জলের সঙ্গে মিশে আন্ডারগ্রাউন্ড নর্দমায় চলে গেছে। ওর বুক হাল্কা হয়ে টনটনে ব্যথা কমে গেছে বটে, তবে অপরাধবোধের পাহাড় বুক থেকে নামেনি আজও। তিনমাসের বাচ্চাটা মায়ের বুকে এত দুধ থাকতেও ফীডিং বটলে কৌটার দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। যে সময়টাতে শিরিণের অ-জ্ঞানত এবং একটু বড় হবার পর স-জ্ঞানত মাকে পাশে পাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল তখন ও মাকে সকালবেলা ঘণ্টাখানেক পেয়েছে মাত্র। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত মা যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বিছানায় বসে থেকেছে অনেকক্ষণ সেই দৃশ্যগুলো শিরিণ কখনও দেখেনি, কারণ ও তখন ঘুমন্ত। তখন শিরিণকে দেবার মতো সময়ের অভাব ছিল, আর সেই ফাঁকে মেয়ে আস্তে আস্তে দূরে চলে গেছে। পারিবারিক মানমর্যাদা, আচার-ব্যবহার বোঝার বয়স হয়নি তখনও। ওর মধ্যে এইসব শিক্ষা-দীক্ষাগুলো ঢোকাবার জন্য অ্যানি গোমসয়ের চেষ্টার অন্ত ছিল না জানে দেবাঙ্গনা। মিস গোমস দেবাঙ্গনাকেও বলেছেন, 'ওর শিশু মন মৌন হয়ে বিদ্রোহ করছে মিসেস জাভেরি। বাড়িতে থাকলে ও নিজে থেকে কথাই বলে না, হাসি আমি ওর মুখে দেখিই না। আপনি যে এত খেলনা দেন, মি: জাভেরি বিদেশ থেকে যত আধুনিক খেলনা নিয়ে আসেন সব ওর নার্সারি রুমে অবহেলায় পড়ে থাকে। ও ওগুলোতে হাতও লাগায় না। অথচ সেই মেয়ে মাটিতে ধুলো মেখে মার্বল খেলার সময় কত যে প্রাণবন্ত থাকে, বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি, মাতামাতি করে আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ওদের মাঝখানে ও যেন নিজেকে সিকিওরড মনে করে, অথচ নিজের বাড়িতে কেমন ইনসিকিওর বোধ করে। সারাক্ষণ ওর সঙ্গে থেকেও আমি বুঝতে পারি না ওর মনের ভেতর ওল্ড কোর্ট ইয়ার্ডের ওর সেম স্ট্যাটাসের বাচ্চাদের প্রতি এত বিতৃষ্ণা কেন? একই স্কুলে যায়, এক ক্লাশে পড়ে, কিন্তু ওদের সঙ্গে মেশে না, বন্ধুত্ব করে না, খেলা করা তো দূরের কথা, ওরা ডাকলে সাড়াও দেয় না, কথাও বলে না। আমার মনে হয় হাইক্লাশ সভ্য সোসাইটির প্রতিই যেন ওর বিদ্বেষ।'

দেবাঙ্গনা বলেছিল— 'কেন এরকম হয়? আমার মা-ও ওয়ার্কিং ওমেন ছিলেন। আমি ছোটবেলা থেকে মাকে কাছে পেতাম না। এমনিতে সারা বছর মা যেমন চাকরি করতে অফিসে যেতেন, আমিও স্কুলে চলে যেতাম। বাড়িতে একজন রান্নার মহিলা ছিল সর্বক্ষণের। ওকে মাসি বলে ডাকতাম। স্কুল থেকে এলে সে খেতে দিত। বাবা-মা-র ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। গরমের, দুর্গা পুজোর ছুটিগুলো এক মাসের একটু বেশিই থাকত আমাদের স্কুলে। সেই সময় একেবারে একা থাকতে খারাপ লেগেছে ঠিকই, তাই বলে মা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে থাকুক এরকম চিন্তা কখনোই মাথায় আসেনি। আমি তো আমার বাবা-মাকে কখনো একা থাকার কারণে যন্ত্রণা দিইনি? নিরক্ষর রান্নার মাসির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে থেকেছি, ফ্ল্যাটের নীচে বন্ধুদের সঙ্গে খেলে, গল্প করে সময় কাটিয়েছি। নিজে নিজেই পড়তে বসেছি। শুধু আমি কেন, বন্ধুদের মা-রাও বেশিরভাগই চাকরি করতেন। ওরাও আমার মতো একাই থেকেছে। কই, আমরা কেউ তো শিরিণের মতো হইনি! আজকের যুগে জয়েন্ট ফ্যামিলির অস্তিত্ব নেই, লক্ষ লক্ষ ওয়ার্কিং ওমেন তিনমাসের মেটারনিটি লিভ শেষ হলে ওইটুকু বেবিকে প্রাইভেট চাইল্ড কেয়ার সেন্টারগুলোতে জমা দিয়ে অফিস চলে যায়। ফেরার পথে বাচ্চাকে কালেক্ট করে নিয়ে ঘরে ফেরে। ওইসব চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে আন-হাইজিনিক পরিবেশে আন-ট্রেইন্ড আয়াদের কাছে বাচ্চারা কী অবস্থায় থাকে বুঝতেই পারছেন। দুর্ঘটনাও ঘটে তবুও লোকে বাধ্য হয়ে রাখে, কারণ এখন তো কেউই ইন-লজ অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেওরের সঙ্গে থাকতে চায় না, তাহলে বাচ্চা পালন করার দায়িত্ব নেবে কে? বিদেশের মতো সরকারি ব্যবস্থা এখনও একটিও নেই এদেশে, এই প্রবলেম মোটাবার জন্য। তাই বলে কি এদেশের শিশুরা বড় হচ্ছে না? চাকুরিজীবী মায়েদের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এভাবে তাপ্পি মেরেই বড় হয়ে যাচ্ছে। ওরা সবাই যদি শিরিণের

মতো মানসিকতা নিয়ে বড় হতো তাহলে এদেশের ইয়ুথ পাওয়ার কবেই মুখে থুবড়ে পড়ে যেত মিস গোমস। সেটা তো হয়নি! চারদিকে উচ্চশিক্ষার ছড়াছড়ি। তার মানে ওরা মানুষ হচ্ছে, তাই তো? তাহলে আমার মেয়ে ওর মনগড়া কোন দুঃখে কাতর হয়ে থাকে বলুন তো? তিনমাস বয়স থেকে আপনার অপরিসীম যত্নে বড় হয়েছে, এখনও একই যত্ন পাচ্ছে আপনার কাছে। আমি নিজে কখনোই এত কেয়ার সম্ভবত করতেই পারতাম না। নিজের সর্বসুবিধাযুক্ত অতোবড় বাড়িতে আমাদের দুজনের আদর-আহ্লাদ ভোগ করছে, সাইরাস এলে আদরের পরিমাণ হাজারগুণ বেড়ে যায়, এতো-র পরেও ওর কীসের অভাব সেটাই বুঝতে পারি না। মাঝেমাঝে মনে হয় ও জেনেশুনে ইচ্ছে করে আমাদের ব্ল্যাকমেল করছে। ন'বছরের অনেক বাচ্চাদের মাথায় বয়স্ক মানুষের মতো বদমাইশি বুদ্ধি থাকে। ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডে আমার ইমেজ খারাপ করার জন্য চেষ্টা করছে হয়ত।'

অ্যানি দুঃখিত গলায় বলল, 'না মিসেস জাভেরি। হতাশায় ভেঙে পড়ে আপনি শিরিণকে ভুল বুঝছেন। জন্ম থেকে অরফ্যানেজ-এ বড় হয়েছি আমি। অ্যারোগেন্ট, ইনসোলেন্ট বাচ্চা দেখেছি অনেক। সাত বছরের ছেলের ক্রাইমের প্রতি আসক্তি দেখে সিস্টাররাও চমকে গেছেন। কিছু বাচ্চা জন্ম থেকেই মিথ্যেবাদী, সত্যিকথা বলতে শেখানোই যায় না ওদের। আমি যে পরিবেশ থেকে এসেছি, সেখানে খুব ভাল, মাঝারি, মন্দ এবং অতিমন্দ সবরকম শিশু চরিত্রের সঙ্গে জীবনের কুড়িটা বছর কাটিয়ে বাইরের জগতে এসেছিলাম। বাইরের জগতেও এই চার শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই সমাজ। শিরিণের মধ্যে ঔদ্ধত্য নেই, বড়লোকের মেয়ে বলে অহঙ্কার নেই, তাই ও স্লাম ডুয়েলার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে পারে। অন্যায় করলে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে ইতস্তত করে না কখনও, আই রিপিট, শিরিণ কখনও মিথ্যে কথা বলে না। এটিকেট ম্যানার্সয়ে ওর কোনো ত্রুটি নেই। হিংসা-মারামারি এসবের উর্দ্ধে আমাদের শিরিণ। খেলায় হার-জিত নিয়ে রেষারেষি করতে দেখিনি ওকে। শি ইজ কোয়াইট আ নাইস গার্ল। সরি মিসেস জাভেরি, ইওর হার্শ এলিগেশন দ্যাট শি ইজ আ কন্সপিরেটর ট্রাইং টু ডিফেন্স ইউ ইজ হার্ডলি অ্যাক্সেপ্টেবল টু মি। রিডিকিউলাস! ডোন্ট ডিসট্রাস্ট ইওর লিটিল ডটার হু ইজ এ পারফেক্টলী নর্মাল চাইল্ড। টু-ডে আই উইল স্ট্যান্ড বাই হার সাইড, স্পিক ফর শিরিণ। শিরিণ ইজ নট ইওর এনিমি, শি ইজ নট ট্রাইং টু ব্ল্যাকমেল নাইদার ডিফেন্স ইউ মিসেস জাভেরি। হু নোজ বেটার দ্যান মি হাউ মাচ ডাজ শি অ্যাডোর ইউ! ডিড ইউ এভার নোটিশ দ্যাট শিরিণ হ্যাজ গ্রোন-আপ, নট এ্যান ইনফ্যান্ট এনিমোর? নাউ শি হ্যাজ হার ওন ওয়ে অফ থিংকিং, ওন ফীলিংস, ওন ভিশন টু ইমাজিন— শি ব্যাডলি নীডস ইউ টু শেয়ার এভরিথিং শি ফীলস্!.. শি লাভস মি ভেরিমাচ, রেসপেক্টস আ লট, বাট ডাজ নট ফিল কম্ফোর্টেবল টু শেয়ার। আই প্রিজিউম দ্যা পুত্তর কিড ইজ ট্রাইং হার্ড টু ড্র ইওর এ্যাটেনশন টু সি হাউ লোনলী এ্যান্ড আনহ্যাপি শি ইজ! মিসেস জাভেরি আ গভর্নেস ক্যান নেভার সাবস্টিটিউট আ মাদার ইউ নো? বাই হুক অর বাই ক্রুক প্লীজ ম্যানেজ ভেকেশন, গো টু এ বিউটিফুল রিসর্ট উইথ শিরিণ, মেক হার ফীল ইওর অ্যাটাচমেন্ট, লাভ এ্যান্ড স্পনটানিউয়াস প্রেইজেস। ইট উইল ডু ম্যাজিক অন হার অ্যাটিচিউড আই বিলিভ!'

দেবাঙ্গনা এতক্ষণ নীরবে শুনছিল আর বুঝতে পারছিল গভর্নেস কখনও মা হতে পারে না— কথাটা মিস গোমসয়ের বেলায় খাটে না। উনি চিরকুমারী হয়েও নিজের অজ্ঞাতসারেই শিরিণের মা হয়ে গেছেন। জন্মদাত্রী মা হয়ে ও মেয়ের জন্য এত উতলা হয়নি কখনো, মেয়ের চরিত্রে কিছু বৈষম্য নজরে পড়েছে যেগুলোকে ও ইচ্ছাকৃত অসভ্যতা বলেই ভেবেছে। অনেক বাচ্চা এরকম অসভ্যতা করে বাবা-মাকে অযথা অপদস্থ করার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়, বড় হলে এসব চলেও যায়। মিস গোমসের সঙ্গে সময় পেলে শিরিণকে নিয়ে কথা হয় ওর, মেয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে ছাড়ে না, কিন্তু এত ডিটেলস-এ ঢুকে যাচাই করে দেখার কথা মনেও আসেনি, অবকাশও হয়নি। আজও আবার মনে হয়, পূর্বজন্মের পুণ্যফলে মিস গোমসকে ওরা পেয়েছিল। আজ উনি রীতিমতো ওকে বেশ কঠোরভাবেই বকেছেন কিন্তু একটুও খারাপ লাগেনি ওর। বরং মনে হয়েছে ওর থেকে বেশ বয়সে বড় এই নিঃস্বার্থ মানুষটি গুরুজনের মতো ওকে শাসন করার অধিকার অবশ্যই অর্জন করেছেন। দশ বছরে মিস গোমসয়ের মতো বিনম্র একজন মানুষ ও অন্তত আর একজনও দেখেনি। আজই প্রথম ওঁকে রাগ করতে দেখল। কেরলের অরফ্যানেজ ওঁকে জীবিকা নির্বাহের জন্য চাইল্ড নার্সিং অ্যান্ড কেয়ারের ট্রেনিং দিয়ে ডিপ্লোমা দিয়েছিল। সেই কাজে ওঁর ডেডিকেশন শতমুখে বলেও পুরো বর্ণনা করা যাবে না। উনি শুধু তিনমাস বয়স থেকে শিরিণকে বড়

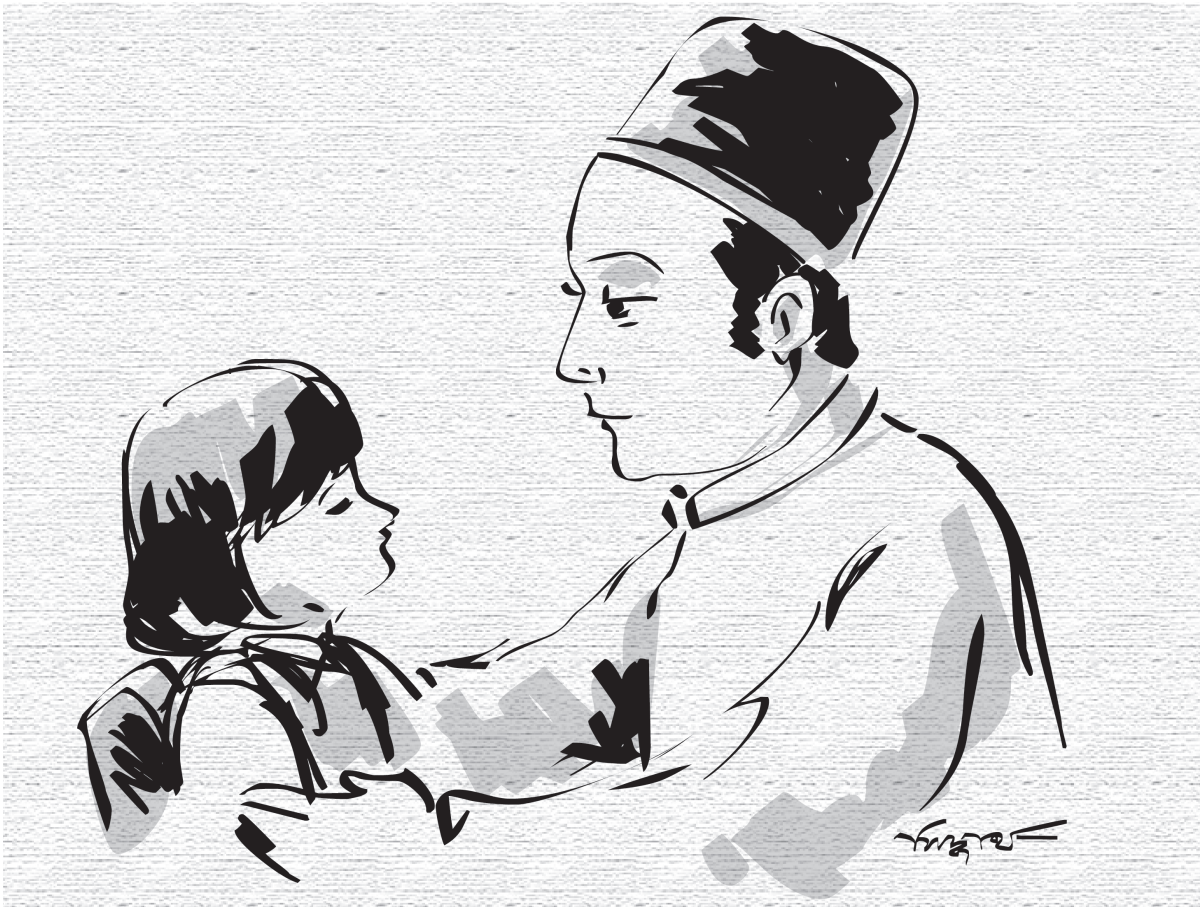

করেছেন তা নয়, এই সংসারের তদারকি করেছেন, বান্দ্রায় সাইরাসের বাবার রেখে যাওয়া কিউরিও শপে সপ্তাহে একদিন করে ভিজিট করে অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে আসার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দেবাঙ্গনাকে সব নাগপাশ থেকে মুক্ত করে একাগ্রভাবে অভিনয় করার জন্য সুযোগ এবং সময় দুটোই দিয়েছেন। কোনো কিছু নিয়েই দেবাঙ্গনাকে চিন্তা করতে হয়নি, দৌড়োদৌড়ি করতে হয়নি। সাইরাস এখানে নেই বলে জরুরি কোনো কাজই আটকে থাকেনি। সব ঝঞ্ঝাট মিস গোমস সামাল দিয়েছেন।

আজ যে রেগে গেলেন সেটাও যুক্তিসঙ্গত। শিরিণ ক'দিন পরেই পুরো দশ বছরের হবে। ছোটবেলায় মা-র অনুপস্থিতি বোঝার জ্ঞান ছিল না। সাত-আট বছর বয়স থেকে মার কাছে না থাকার অভাব বুঝতে শুরু করেছিল। আর তখন থেকেই অতবড় বাড়িতে সঙ্গীহীন হয়ে থাকার কষ্ট উপলব্ধি করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেনি। বাড়ির কাছেই ওল্ডকোর্টের দুশো বছরের পুরনো বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকে দেড়শো বছরের স্কুল। দুটো স্ট্রাকচারের মধ্যেই দেবাঙ্গনা মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে পায়, যদিও ওর পার্শী প্রতিবেশীরা বলে— না, না। এগুলো পার্শীদেরই তৈরি। সে যাই হোক, এখানকার পার্শী শিশুরা এই স্কুলেই বিদ্যারম্ভ শুরু করে থাকে। সাইরাস, ওর বাপ-ঠাকুর্দা সকলেই এই স্কুলে পড়েছে ছোটবেলায়। প্রথম বছরদুয়েক কেউ দিয়ে-আসা নিয়ে-আসা করে, তারপর এইটুকু পথ বাচ্চারা নিজেরাই যায় একা একা। স্কুলের পথেই ড্যাংগুলি খেলুড়েদের খেলার জায়গা। এই প্রাচীন পার্শী কলোনির অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে শুনেছে যে ড্যাংগুলি খেলাটাও নাকি এখানে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। ওঁরাই বলেছেন— তোমার মেয়ের আগেও আমাদের অনেক ছেলে এই খেলায় আকৃষ্ট হয়ে ওদের সঙ্গে খেলেছে। ওরা গরিব তবে খারাপ নয়। আমরা বলা সত্ত্বেও ওদের মা-বাপ ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। তের-চোদ্দ বছর বয়স হলেই কোথাও কাজে লাগিয়ে দেবে। ভয় পেয়ো না, একটু বড় হলে শিরিণ নিজেই ওদের সঙ্গ ছেড়ে দেবে। আমরা তো এরকম হতেই দেখে আসছি।

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE ULTRA RED-OXIDE

जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : scibwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : scical@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scidel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Fax : 91 33 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

পার্শী মেয়েরা অবশ্য খেলেনি আগে, শিরিণই প্রথম।

শিরিণ অনেককিছুই প্রথম করছে যা সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল সংস্কারিত পার্শী সমাজের মেয়েরা করে না। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে এক পা এগোয় না, নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো কাস্ট রিলিজিয়নে বিয়েতে রাজি হয় না। এখানে প্রত্যেকটা বাড়ি একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সাইরাস বলেছিল— আমার বাবা-মা নেই কিন্তু এত বেশি আত্মীয় আছে যে তুমি দেখে অবাক হয়ে যাবে। জানো, ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের সবাই আমার রিলেটিভ। আমরা এমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি যে, একজনের সামান্যতম বিপদ ঘটলে পুরো কলোনি এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়বে। ১৮৩০ সালে ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডে পার্শীরা নিজেদের জন্য কলোনি বানিয়েছিল— ইনফ্যাক্ট পুরো জমিটা কিনে নিয়েছিল বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে। জানো, শর্ত অনুযায়ী ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডে একমাত্র পার্শী ছাড়া অন্য কোনো জাতি-ধর্মের লোক জমি, বাড়ি করতে পারবে না। সেই নিয়ম এখনও বজায় আছে। পরে তোমাকে একদিন আমাদের ইতিহাস বলব, আমাদের ধর্মের কথা বলব। সব জানার পর তুমি ডিসাইড করো আমাকে বিয়ে করবে কিনা। — এসব অন্য প্রসঙ্গ। এখন প্রসঙ্গ সাইরাসের মেয়ে শিরিণ যাকে নিয়ে মিস গোমসয়ের এত চিন্তা।

অ্যানি অনেকক্ষণ দেবাঙ্গনাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন— 'আমার কথায় আপনি কি দুঃখিত হলেন মিসেস জাভেরি? উত্তেজনার বসে যদি আঘাত করে কোনো কথা বলে থাকি, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি।'

দেবাঙ্গনা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে— 'না, না, মিস গোমস। আপনি তো একটাও বেঠিক কথা বলেননি। ইনফ্যাক্ট শিরিণের জন্য আপনি যেভাবে ভাবনা-চিন্তা করেন আমি তো সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবিইনি কখনো। আজ ভাবছি, কারণ আজ আপনি আমার বন্ধ চোখ খুলে দিয়েছেন। ভুলে গিয়েছিলাম একদিন আমারও দশ বছর বয়স ছিল। টিন-এজ-এ ট্র্যানজিশনের ঠিক আগের দু-তিনটে বছর কত ক্রুশিয়েল থাকে! একদিকে নানারকম কৌতূহল বিশেষ করে নিজের শরীর নিয়ে, জন্ম নিয়ে কত প্রশ্ন জাগে মনে যার উত্তর জানা থাকে না, আর কাউকে জিজ্ঞেসও করা যায় না। কারণ দশ বছর বয়সেই 'লজ্জা' নামের অনুভূতির প্রথম প্রকাশ ঘটে জীবনে। মেল-ফিমেলের দুস্তর ফিজিক্যাল ডিফারেন্সের কৌতূহলটাই মনকে সবচেয়ে প্রথম আন্দোলিত করে, তার পরের প্রশ্ন আসে রাস্তায় দেখা ডগ অ্যান্ড বিচের ফরনিকেশন নিয়ে। সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না বলেই ইমপ্র্যাক্টিক্যাল ওয়াইল্ড ইমাজিনেশন মনে বাসা বাঁধে। আপনি একেবারে ঠিক কথা বলেছেন মিস গোমস, এই সময়টাতেই বাচ্চারা সজাগ চোখ দিয়ে জগতকে প্রথম দেখে, জাগতিক রহস্য নিজের মতো করে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়। হ্যাঁ, এই সময়টাতেই মাকে সবচেয়ে বেশি দরকার আমিও এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু কী করে যে সময় বের করব সেটাই বুঝতে পারছি না। দুটো মুভি ফাইনাল স্টেজে আছে। আমিও তো ডাইরেক্টর প্রোডিউসারের কাছে কমিটেড। এখন ভেকেশন চাওয়া যাবে না উল্টে এক সপ্তাহ পরে আমাকেই আউটডোর শুটিংয়ের জন্য রাজস্থানে যেতে হবে কম করেও পনেরো দিনের জন্য।'

অ্যানির শ্যামলা রংয়ের মুখখানা ধারালো হয়ে যায়। ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'আপনি ডাইরেক্টার প্রেডিউসারের কাছে কমিটেড, কিন্তু মেয়ের কাছে কি আপনার কোনো কমিটমেন্ট, কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই মিসেস জাভেরি? আপনি তো কোনোদিন শিরিণকে স্টুডিওতে কিংবা লোকাল লোকেশনেও শ্যুটিং দেখাতে নিয়ে যান না। এবার না হয় রাজস্থানে সঙ্গে নিয়ে যান। এখন তো ন্যাপি চেঞ্জ করানো, ফিড করানোর ঝামেলা নেই যে শ্যুটিং ডিস্টার্ব হবে? ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের একঘেয়ে দিন কাটানোর হাত থেকে শিরিণেরও ক'দিনের জন্য ছুটি মিলবে, চেঞ্জ হবে। আর একটা কথা, আমি আগামী সপ্তাহে পনেরো দিনের জন্য কেরলে যাবো। সিস্টার র‍্যাচেল খুব অসুস্থ, প্রায় আশি বছর বয়স হয়েছে, কোনোদিন চলে যাবেন চিরতরে, তখন আপশোস হবে।'

দেবাঙ্গনা পরিষ্কার বুঝতে পারে মিস গোমস বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বাহানাবাজি আর চলবে না। গত দশ বছরে মাত্র একবার কেরলে গিয়েছিলেন, শিরিণ তখন চার বছরের। সাইরাস এসেছিল তখন তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। অ্যাকটিংয়ে সেই সময় ওর নক্ষত্ররা তুঙ্গে চড়ছে আকাশ ছুঁতে। সময় দেবার মতো সময় নেই। সাইরাস নিপুণভাবে শিরিণের দেখাশুনা করেছিল। এবার সাইরাস নেই গোমসয়ের রিলিভার হবার জন্য। তাই শিরিণকে ওর মার সঙ্গে পাঠাবার উদ্দেশ্য নিয়ে মরিয়া হয়ে মিস গোমস এই চালটি চেলে কিস্তি মাত করলেন। এখন মেনে নেওয়া

ছাড়া উপায় নেই। শ্যুটিং চলাকালীন মেয়ের নজরদারি করা খুবই অসুবিধাজনক, অন্য লোকেরা এসব বুঝবে না। যাই হোক, এবার ওকে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই রাজস্থানে যেতে হবে। বহুবার দুবাই, লন্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যান্ডে লম্বা শ্যুটিং করতে গেছে মিস গোমসের পরমবিশ্বাসী ভরসা ছিল বলে। আজ উনি মেয়ের প্রতি মা'র কমিটমেন্ট জাগিয়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর। আর এই প্রচেষ্টা যে শিরিণের মঙ্গল কামনায় তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। দেবাঙ্গনা আজ প্রথম অভিনয়ের সাহায্য নিয়ে তেতো হতে যাওয়া ব্যাপারটাতে একগাদা চিনি ঢেলে দিল। অবাক গলায় প্রশ্ন করল, 'সে কি? সিস্টার র‍্যাচেল এত অসুস্থ একথা আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন? তিনি আপনাকে মানুষ করেছেন ঠিক যেভাবে আপনি শিরিণকে মানুষ করছেন। সিস্টার র‍্যাচেলই যে আপনার মা! ওঁর অসুস্থতার খবর পাওয়া মাত্র আপনার কেরলে ছুটে যাওয়া উচিত ছিল। আপনিও তো আমার মতো কাজই করে ফেললেন মিস গোমস! শিরিণকে কার কাছে রেখে যাবেন ভেবে ভেবে সিস্টার র‍্যাচেলের প্রতি নিজের কমিটমেন্ট ভুলে গেলেন? ... এক সপ্তাহ পরে নয়, আপনি আগামীকালই ফ্লাইটে কেরল যাবেন। আগে সিস্টার র‍্যাচেল, পরে শিরিণ। আমি আমাদের ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করে আপনার জন্য কালকের টিকিট করে দিচ্ছি। আমি শিরিণকে সঙ্গে নিয়ে এই কয়দিন স্টুডিওতে যাবো।— আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার শিরিণের প্রতি যত্নবান থাকব আমি, ওর কোনো অসুবিধা হতে দেব না।'— দেবাঙ্গনা ওর সেলফোনে নম্বর ডায়াল করতে ব্যস্ত হয়। তখন হাতে হাতে মুঠে ফোনের চল ভারতের বড় বড় শহরে তো বটেই মাঝারি শহরেও এসে গেছে সম্পন্ন শহুরে মানুষদের কাছে, তবে তখনও ইন্ডিয়া পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড্ হয়নি। ঘরে ঘরে কম্পিউটার আর পিঠে পিঠে কালো ব্যাগে ভরা ল্যাপটপ দেখা দেয়নি। ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে দেবাঙ্গনার বলতে থাকা কথার এদিকটা অ্যানি শুনছিলেন চুপ করে বসে— হ্যাঁ, হ্যাঁ। কালকেরই। কী করব বলুন, ইমার্জেন্সি। নাম মিস অ্যানি গোমস্, যা হোক লিখে দিন পঞ্চাশের ওপরেই হবে, ... কত? ফিফটি ফোর? ও. কে.। রিটার্ন টিকিটটা এই দিনদশের পরে রাখুন! আচ্ছা, বেশ আজ দুটো টিকিটই একসঙ্গে চাই... হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। ফেরার টিকিট তো উনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন রে বাবা! যে টিকিট দিতে আসবে ওর হাতেই দিয়ে দেব। ও. কে. থ্যাঙ্ক ইউ... বাই।

ফোন বন্ধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেবাঙ্গনা বলল, 'যাক, হয়ে গেছে! কালকের মধ্যে সিস্টার র‍্যাচেলের কাছে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব। থ্যাঙ্ক গড্। রিটার্ন টিকিটটা দশদিন পরের করিয়েছি। কাল সকাল সাড়ে ন'টায় রিপোর্টিং টাইম। সাড়ে সাতটায় আমরা রওয়ানা হয়ে পড়ব। প্রমোদকে এখনই বলে রাখতে হবে গাড়ি সাড়ে সাতটায় রেডি রাখার কথা।' — দেবাঙ্গনা উঠতে যাচ্ছিল, অ্যানি এতক্ষণে মুখ খুললেন, 'বসুন। প্রমোদকে আমিই বলে দেব। দূরে তো থাকে না, এবাড়ির পেছনে আউট হাউসেই থাকে। ... আপনিও পারেন বটে! আমি ট্রেনে এক সপ্তাহ পরে যেতে পারতাম। আমাকে আর একটা কথা বলারও সুযোগ দিলেন না, একেবারে টিকিট কাটিয়ে ফেললেন প্লেনের! তাও দ-শ দিনের জন্য! এই দশদিন শিরিণ, শ্যুটিং, সংসার— এতসব একা কী করে যে সামলাবেন! শিরিণকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিও চলে যাবেন সে না হয় হলো, কিন্তু স্কুল তো কামাই হবে?'

দেবাঙ্গনা মনে মনে হাসে। বরফ গলছে। ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ তো দেখেননি মিস গোমস! নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই আটকে পড়লেন। মুখে বলে— 'ইমারজেন্সির সময় তৎক্ষণাৎ ডিসিশন নিতে হয়, পরে ভেবেচিন্তে করব ভাবলে সিচুয়েশন ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়। সিস্টার র‍্যাচেলের এই বয়সে যে কোনো সময় কিছু হয়ে যেতে পারে। ওঁকে দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে আগে। এখানকার চিন্তা এখন করবেন না, মুক্ত মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে কাল বেরিয়ে পড়ুন। আপনি ফিরে এলেই আবার রাজস্থান ট্রিপটা রয়েছে। আপনি শিরিণকে সঙ্গে নিয়ে রাজস্থানে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম ওকে একা নিয়ে গেলে ও আমাকে কাছে পাবে ঠিকই কিন্তু আপনাকে মিস করবে। তাই ঠিক করেছি আমরা তিনজনই যাবো। শুধু শিরিণ কেন, আপনারও তো কোথাও যাওয়া হয় না। এছাড়া শিরিণের এতদিন যে স্কুল কামাই হবে সেই পড়াগুলো হোমওয়ার্ক করিয়ে মেকআপ করতে হবে। রোজ রোজ সিনেমার শ্যুটিং দেখতে ভাল লাগবে না। তাই আমি যখন ব্যস্ত থাকব, আপনি আর শিরিণ তখন সাইটসিইং করে ঘুরে বেড়াবেন। আমার নিজের শ্যুটিং যেদিন থাকবে না, সেদিন আমিও সঙ্গে যাব। ওসব জায়গায় গাড়ির ড্রাইভারও হিন্দিতে গাইডের কাজ করে জানি। সবাই একসঙ্গে যাওয়াই ভাল হবে। আর এই দশদিন ম্যানেজ হয়ে যাবে। প্রমোদের বৌ রান্নার ফাঁকে ফাঁকে

ক'দিন সংসার সামলে নেবে, একযুগ ধরে তো আছে এবাড়িতে— সবই জানে।'— সেবার হেরে যাওয়া যুদ্ধটা শেষ অবধি জিতেছিল ও।

— 'মেমসাব স্কুল আ-গয়ে হাম। ছুট্টি তো হো গয়া।' ফেলে আসা জীবনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল দেবাঙ্গনা। প্রমোদের ডাকে ঘোর কাটিয়ে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়ার ঝাপটায় জ্বলে যায় এতক্ষণ ধরে শীতল হওয়া চামড়া। স্কুল ছুটি হলে সব বড় স্কুলের সামনে একই দৃশ্য দেখা যায়। ওদের স্কুলের সামনেও এমনিই হতো। গলগল করে মেয়েরা গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে হাতে 'ডিপার্চার' কার্ড নিয়ে। স্কুলবাস, পুলকার, প্রাইভেট কার, অটো, বাইকের যেন মেলা বসে রোড ব্লক, তার ওপর আবার ঠিক ওদের সময়ের মতোই 'গল্প আর শেষ হয় না' মেয়ের দল গলাগলি করে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোরকমে ভিড় ঠেলে দেবাঙ্গনা গেটের সামনে গিয়ে পৌঁছলো। দারোয়ানকে নাম, ক্লাশ, সেকশন বলা হলে সে একহাতে গেটের সামান্য ফাঁক রক্ষা করে পাশের বক্সটাইপ ছোট্ট খুপরির ভেতরে বসে থাকা লোকটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল— মিস শিরিণ জাভেরি, ক্লাশ টেন, সেকশন বি। দু-মিনিটের মধ্যেই রেজিস্টার দেখে কার্ড চেক করে বক্সে বসা লোকটা চেঁচিয়ে জানালো— শিরিণ জাভেরি ক্লাস টেন ডিপার্চার কার্ড ডিপোজিটেড অ্যারাইভাল কার্ড টেকেন ফোর পাস্ট টেন। যাহ! শিরিণ চারটে দশে চলে গেছে। ও ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের আরও চারজন মেয়ের সঙ্গে পুলকারে আসে যায়। চারটেয় স্কুল ছুটি হয়, ওদের আসতে পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেছে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে। ভেবেছিল আজ যখন ব্রেক পাওয়া গেছে তখন মেয়েকে তুলে নিয়ে ঘুরবে, শপিং করবে। সে আর হলো না— গাড়িতে ফিরে এসে যেন বাঁচলো। কী গরম— কী গরম বাইরে!— 'চলো। শিরিণ বাড়ি চলে গেছে। যাবার পথে কিউরিও শপে একবার যাব।'— অনেক পুরনো, বম্বের নামকরা এই কিউরিও শপ সাইরাসের ঠাকুর্দার সাধের দোকান। ওর বাবাও এটাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন আর সাইরাসও চায় এটা টিকে থাকুক। নিজে দোকানে বসতে পারবে না বলে ডিসঅ্যাবল্ড কাজিন আনন্দ ভার্গিসকে ম্যানেজার করে রেখেছে। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে পিসতুতো ভাই আনন্দের একটা পা অচল। আনন্দ এই দোকান যেভাবে দেখাশুনা করে তাতে দেবাঙ্গনার আসার একেবারেই কোনো মানে হয় না। কিন্তু প্রবল আত্মসম্মান-জ্ঞানী আনন্দ চায় যে সপ্তাহে অন্তত একবার একটু সময়ের জন্য হলেও ও এসে যেন হিসাব দেখে যায়। বাধ্য হয়ে ওকে অনেক ঝামেলা সয়ে আসতে হতো। অ্যানি গোমস যবে থেকে এই দায়িত্বভার নিয়েছেন তবে থেকে ও মুক্ত। আজ ও হিসাব মেলাতে নয়, দেওর আনন্দের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। অনেকদিন দেখা হয় না, এত ভালমানুষ দেওরটার জন্য মন কেমন করছিল।

ওকে দেখে আনন্দের মুখে হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল— 'তুমি? আজ ব্যাপার কী বলত? একটু আগে শিরিণ এলো, পেছনে পেছনে তুমি? কতদিন পরে এলে! আজ সত্যিই আমার দিনটা খুব ভাল মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা কিছু খাবে তো?'

— 'খাবো। তুমি বললে শিরিণ এসেছিল একটু আগে, আমি তো ওর স্কুল হয়েই এখানে এলাম।— দেবাঙ্গনা উদয়ভানুর অসুস্থতা থেকে আদ্যপান্ত ঘটনা দেওরকে বলে জিজ্ঞেস করল— 'শিরিণ তোমার কাছে আসে, একথা বলেনি কখনো।'

— 'সবসময় নয়, মাঝেমাঝে হাতে টাকা শর্ট পড়লে আসে। কী করবে ও? তুমি তো হাজারটা প্রশ্ন করবে ভাবীজান্, তাই চাচুর কাছে আসে। বেশি তো চায় না, সামান্যই।'

— 'আজ কত নিল?'

— 'দু-হাজার। ওর সঙ্গে তিনজন ছিল। একটা মেয়ে আর দুটো ছেলে। চারজনের জন্য দুহাজার টাকায় জুহুবীচে পানিপুরি (ফুচকা) পাপড়িচাট সফট্ ড্রিঙ্কস আর অটো ভাড়াটুকুই হবে। বেচারারা একটা সিনেমাও দেখতে পাবে না, ভাল রেস্টুরেন্টে খেতেও পারবে না।!'

— 'তুমি ওদের বেচারা বলছ আনন্দভাই? মাত্র ষোলো বছর ব....

— 'থামো তো! ষোলো বছরেই এসব হয়। ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করে, বন্ধুত্ব হয়। এই বয়সে বাড়িতে লুকিয়ে মিশবে না তো কি ছত্রিশ বছরে মিশবে? .. চোখ বন্ধ করো তো ভাবীজান্।'

— 'ওমা! কেন? তুমি আবার আমার চোখে ধুলো দেবে না তো?'

— 'আরে না-রে বাবা! চোখ বন্ধ করে নিজের ষোলো বছরে গিয়ে ঢুকে পড়। হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। এবার হাতড়ে হাতড়ে খোঁজো। সব কটাকে পেয়েছ যেগুলোর সঙ্গে তোমাদের কলকাতার গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া,

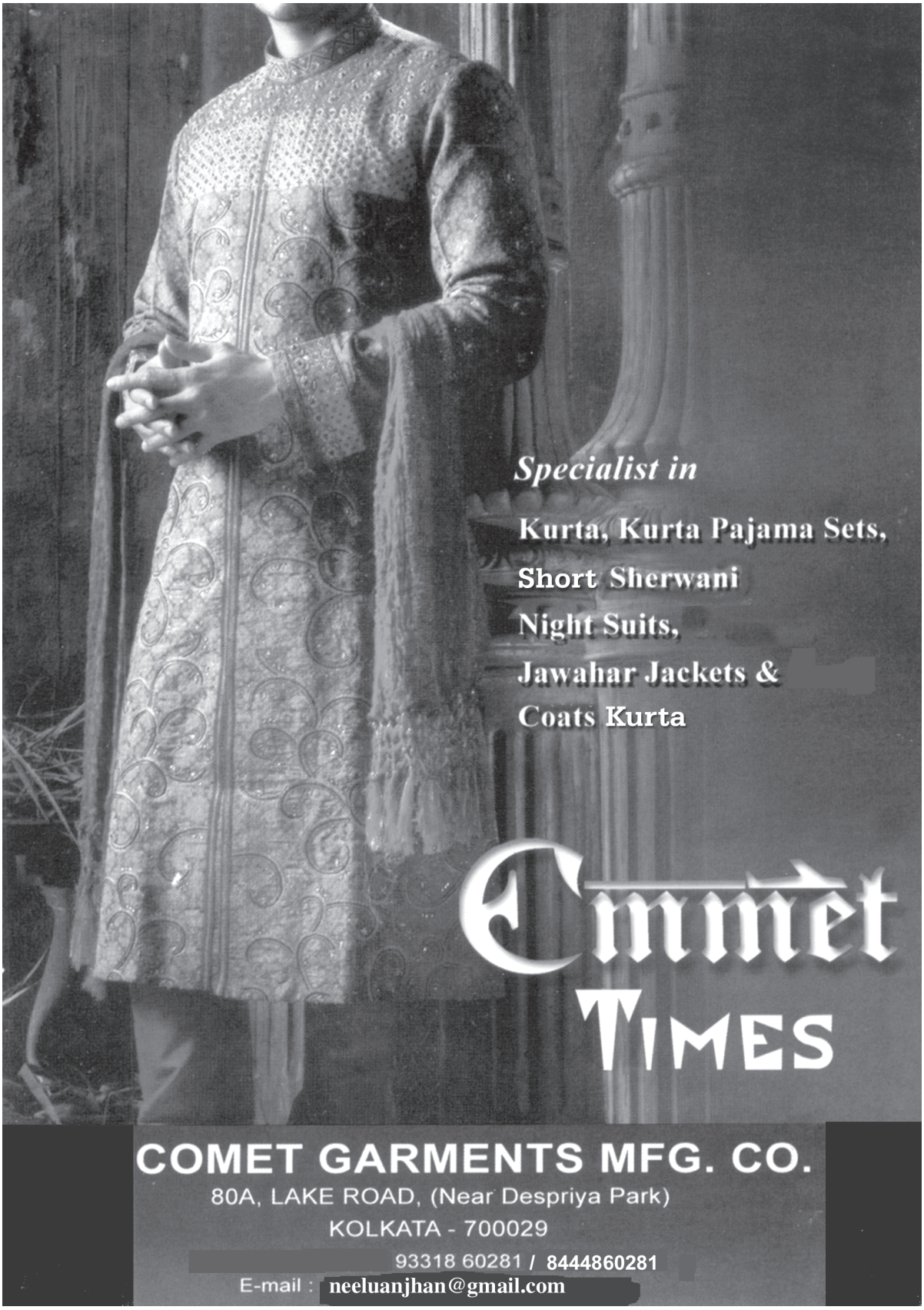
Specialist in
Kurta, Kurta Pajama Sets,
Short Sherwani
Night Suits,
Jawahar Jackets &
Coats Kurta
Comet
TIMES
COMET GARMENTS MFG. CO.
80A, LAKE ROAD, (Near Despriya Park)
KOLKATA - 700029
93318 60281 / 8444860281
E-mail : neeluanjhan@gmail.com

লেকের ধার, গঙ্গার ঘাট— এসব জায়গায় ঘুরতে? যতক্ষণ সবকটাকে ধরতে না পারছ চোখ খুলো না।'

দেবাঙ্গনা ফিক্ করে হেসে চোখ খুলে তাকিয়ে বলল— 'এই জন্যই তোমাকে ভালবাসি। তুমি ছাড়া এমন সহজ করে মামলা খারিজ আর কেউ করতে পারত না। ভয় নেই, তোমার আল্লাদি ভাইঝিকে বকাবকি করব না।'

— 'শুনে আনন্দ আনন্দিত হলো। কিন্তু তুমি তো খুঁজতে বেশি সময় নিলে না?'

দেবাঙ্গনা আবার হেসে ফেলে বলল— 'ওই বয়সে সুন্দর, স্মার্ট ছেলে দেখলেই ভাল লেগে যেত। ওই ভাললাগার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে এখন আর ওদের চেহারাই মনে নেই তো ধরে আনব কী করে? চোখ বন্ধ করে তো শুধু সাইরাসের মুখটাই দেখলাম।'

আনন্দ এবার হেসে ফেলল, বলল— 'খুব চালাক। এই না হলে আর বাঙালির বুদ্ধি?'

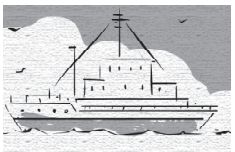

— 'তুমি বুঝতে চাইছ না শ্রাবণী। সুযোগ মানুষের জীবনে বড় দুর্লভ বস্তু। একটা সামান্য সুযোগের জন্য কত লোক সারাজীবন কেঁদে মরে। হয়তো একবার ভগবান কৃপা করলে জীবনের মোড় ঘুরে যেত, কিন্তু কৃপণ ভগবান সহজে সবাইকে সুযোগ দেন না। আবার কারও বেলায় না চাইতেই খুব ভাল সংযোগ ঘটিয়ে দেন। এক্ষেত্রে অযাচিত ভাবে সুযোগ এসে দরজার কড়া নাড়ছে আর তুমি কিনা নিতেই রাজি হচ্ছে না! তুমি কেমন মা গো? অন্য কেউ হলে খুশি হয়ে নেচে উঠত।'— রাজ্য সরকারি মাঝারি অফিসার অজিত মুখোপাধ্যায় স্ত্রীকে বাগে আনতে না পেরে রাগের চোটে খাবার টেবিলেই একটা মোক্ষম ঘুঁষি মারেন। খালি চায়ের কাপটা একলাফে মাটিতে আশ্রয় নিতে গিয়ে তিনটুকরো হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অজিত কিঞ্চিত অপ্রস্তুত হয়ে ঝুঁকে মৃত কাপের দেহাবশেষ তুলতে চেষ্টা করতেই শ্রাবণী সংযত গলায় বলেন— 'থাক। হাত কেটে নতুন ফ্যাসাদ বাঁধাতে হবে না। আমারও অফিস যাওয়া আছে এখন ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় নেই।'

অজিত সশব্দে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন— 'তোমার পাতি আপত্তি ধোপে টিকবে না। সোনার জীবনে গায়ে পড়ে চলে আসা এতবড় সুযোগ মাঠে মারা যেতে দেব না আমি। তুমিও বি এ পাশ করে কলম পিষে কেরানিগিরি করে চলেছ আর আমিও ডব্লিউ বি সি এস হয়ে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে ত্রিশঙ্কু। কোন শালা চেনে আমাদের? প্রমোশন, নাম-যশ, ক্ষমতা— কোনটা পেয়েছি? ভাল সময়ের মুখ দেখিনি নিজেদের জীবনে। এতদিনে ঘুরপথে সুযোগ এসেছে সোনাকে উপলক্ষ্য করে। এ সুযোগ বিফল হতে দেব না আমি।'

ক'দিন ধরে এবাড়ির দম্পতির মধ্যে মতের অমিল নিয়ে বচসা চলেছে। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। আঠারো বছরের দাম্পত্যে আঠারোটা বিষয়েও ওরা একমত হতে পারেনি কখনো। ইগো ক্ল্যাশ লেগেই থেকেছে। কখনো শ্রাবণীর জেদের কাছে অজিত মাথা নামিয়ে শান্তি রক্ষা করেছে, আবার কখনো শ্রাবণী নরম হয়ে মেনে নিয়েছে তাই বিয়েটা ভাঙেনি। অর্থাৎ একটা অন্তঃসলিলা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ধারা দুজনের ভেতরেই বয়ে চলে নিশ্চয়। ভালবাসার বিয়ে নয় ওদের, সম্বন্ধ করে দুই পরিবারের এক লক্ষ একটা কথাবার্তা, বোঝাপড়া হয়ে ছাদনাতলায় গেছে। প্রেম-ভালবাসা হয়ে থাকলে বিয়ের পরই হয়েছে। অজিত ডব্লিউ বি সি এস, তার উপরে অত্যন্ত সুদর্শন। এমন ছেলের উপযুক্ত অপরূপ সুন্দরী, মিনিমাম গ্র্যাজুয়েট পাল্টিঘরের পাত্রী খুঁজতে অজিতের মা-র কালঘাম ঝরেছে। রং ফর্সা তো ছিরিছাঁদ ভাল নয়, এ দুটো ভাল তো মেয়ে মাত্র পাঁচফুট এক ইঞ্চি। আবার সবই মাপজোক মতো পাওয়া গেল তো মাথায় ফিনফিনে পাতলা চুল। দুটো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবশেষে অজিতের মা-র সমস্ত চাওয়া পূর্ণ করে শ্রাবণীকে পাওয়া গেল। বিয়ের দেড় বছর পর মেয়ে হলো। মা-বাবার সব সৌন্দর্য ছিনিয়ে নিয়ে মেয়ে আরও বেশি সুন্দর, অনন্য রূপসী হয়ে উঠল। আজকাল বেশি রূপ থাকাও ভয়ের কারণ। শ্রাবণী তাই মেয়েকে একেবারে সাধারণ জামাকাপড় মামুলি সাজের বেশি কিছু করতে দেয় না। গায়ের চামড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকা কিংবা ছোট পোশাক সোনার পরা হয় না। ষোলো বছরের সোনা এবার দিল্লি বোর্ডের আই সি এস ই পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসে বোর হচ্ছে। ওর বাবা-মার বর্তমান অশান্তির কারণ ওকে নিয়ে। না-না, ও কোনো গর্হিত অপরাধ করেনি, করেছে ওর মাপ-জোক, ঘনদীর্ঘ চুল, লম্বা সুঠাম ফিগার, মুখের ছিরিছাঁদ— এসব।

বাংলা আর্ট ফিল্ম জগতে কুল্যে তিনচারজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের অন্যতম সেরা শান্তনু ঘোষের ভায়রাভাই শ্রীষ হলো অজিতের হরিহর আত্মা বন্ধু। ভায়রাভাই শান্তনু চার-পাঁচ বছরে একখানা ফিল্ম করে বড়জোর, আর সেই ফিল্ম দেশে বিদেশে প্রবল আন্দোলন তুলে বন্দিত হয়ে অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে বাংলা এবং বাঙালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করে আসছে বারবার। শান্তনু এবার যে ছবিটা করবে সেটার জন্য পনেরো থেকে ষোল বছরের মধ্যে অসামান্য সুন্দরী এক কন্যার প্রয়োজন নায়িকার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। অভিনয় জানা থাকার দরকার নেই, সে কাজটা শান্তনু নিজেই করিয়ে নেবে। যা দরকার সেটা হলো কাহিনি এবং পরিচালকের কল্পনার সঙ্গে তালমিল বজায় রেখে সেই কন্যাকে খুঁজে বের করা। শ্রীষ-য়ের ভায়রাভাই তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। শ্রীষ ভায়রাভাইয়ের মুখে কল্পিত নায়িকার বর্ণনা শুনেই বুঝে ফেলেছিল শান্তনুর নায়িকা ওর হাতের নাগালেই আছে। সময় নষ্ট না করে বন্ধু অজিতের শরণাপন্ন হয়ে বলেছিল— 'তোর মেয়ে সোনাকে দে ভাই! শান্তনুকে ছবিটা করার জন্য এইটুকু সাহায্য কর। আমি ওকে সোনার কথা বলতেই শান্তনু বলেছিল— ওকেই তো আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি শ্রীষ! তুমি একবারটি আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে চল।'

শান্তনু ঘোষ এলেন দেখলেন এবং জয় করে নিলেন। বিশেষ করে যার সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল সেই শ্রাবণীকে। আগেকার দিনের পাত্রী দেখার মতো শান্তনু সোনার খোলা চুল দেখলেন। খুশি হয়ে বললেন— 'এই চুল কখনও কেটে ছোট করিস না কিন্তু। তুই এত কাছে ছিলি আর আমি বর্ধমান থেকে বাগডোগরা অব্দি তোকেই খুঁজেছি। সোনা তো বোধহয় ডাক নাম, তোর ভাল নামটা বল। কনট্রাক্ট ফর্মে লিখতে হবে তো।'

— 'আমার ভাল নাম দেবাঙ্গনা মুখোপাধ্যায়।'

শান্তনু ঘোষের নতুন ছবি 'অন্তর্বাহ' আরও একবার পরিচালককে শ্রেষ্ঠ চলচিত্রের শিরোপা পরিয়ে দিল। বাংলা ছবিটি আরও দুটো ভাষায় 'ডাব' করা ছিল— হিন্দি আর ইংরাজি। যে কারণে সর্বভারতীয় দর্শক সমাজের কাছে একই সঙ্গে রিলিজ হয়ে পৌঁছে গেল। সারা দেশের ইংরাজি-হিন্দি সংবাদপত্রগুলো পরিচালক আর নতুন অভিনেত্রীর অসামান্য অভিনয়ের প্রশংসায় মুখর হলো। সোনা নামের 'কেউ চেনে না' মেয়েটাকে সারা দেশ একমুহূর্তে চিনে ফেলল। পত্রকার, ইলেট্রনিক মিডিয়ার ইন্টারভিউ দিতে দিতে ক্লান্ত সোনা সব ক্লান্তি ভুলে যায় যখন বাবা-মার গলা জড়িয়ে ধরে থাকা রঙিন ফটোগুলো খবরের কাগজে, সিনে ম্যাগাজিনে এমনকি টিভিতেও দেখায়। বাবার চোখেমুখে এখন আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। অফিসে, পাড়ায়, চেনামহলে অজিতের এখন বিশেষ কদর, লোকে বেশ সমীহ করে কথা বলে আজকাল। ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন হয়নি বলে আর দুঃখ নেই ওর। দেবাঙ্গনা মুখোপাধ্যায়ের বাবার পরিচয় প্রমোশনের চেয়েও বেশি সুখের। মেয়ে বেস্ট অ্যাকট্রেসের জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। অন্য আরও পুরস্কার তো আছেই। সবচেয়ে ভাল লাগে সোনার নিরহংকার বিনম্রতা। যখনই কোনো ইন্টারভিউ দেয় তখনই বলে— 'আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। শান্তনুকাকুর কৃতিত্ব। অ্যাকটিংয়ের 'এ'ও জানা ছিল না আমার, সত্যি বলতে অ্যাকটিং উনিই করেছেন আমি শুধু প্রক্সি দিয়েছি। কোনো পুরস্কারটাই আমার প্রাপ্য ছিল না নিজের ক্ষমতায়, শান্তনুকাকু অসম্ভব পেসেন্স রেখে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছেন। মানুষ আজ আমাকে যে সম্মান দিচ্ছেন সেই সম্মানের হকদার আরও একজন আছেন। তিনি না থাকলে এই জায়গায় আমি কখনোই পৌঁছাতে পারতাম না। তিনি আমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী শিরিষ মিত্র, আমার শ্রীষ কাকু। একরকম জোর করেই শ্রীষকাকু আমাকে এই চরিত্র অভিনয় করার জন্য পরিচালক শান্তনুকাকুর কাছে এনে ফেলেছিলেন। আমি যা পেয়েছি সবটুকুই শ্রীষকাকুর পাওয়া'— একটা শ্যুটিং স্টার আকাশ পার হবে বলে পূর্বাকাশ থেকে পশ্চিমাকাশের দিকে ছুটে গিয়েছিল।

শান্তনু ঘোষ বলেছিলেন— 'এখন অফারের পর অফার আসবে। বাংলা কমার্শিয়াল সিনেমা থেকে এমনকী ছোট পর্দায় ছোট টেলিফিল্ম, মেগা সিরিয়াল থেকে ডাক আসবে। ভুলেও ওগুলোর ফাঁদে পা দিবি না আরও জনপ্রিয়তার লোভে। জনপ্রিয়তা তুই অর্জন করে নিয়েছিস। বাংলা, বোম্বে দক্ষিণ ভারতের দিকপাল পরিচালকদের নজরে তোর চেহারা, অভিনয় বাঁধা পড়ে গেছে, ওঁরা ঠিক সময়ে ডাকবেন দেখিস। তখন সাড়া দিবি। এখন পড়াশুনায় মন দিয়ে লেগে পড়।'

অভিজ্ঞ শান্তনু ঘোষের কথা ফলে গিয়েছিল। অজিত-শ্রাবণী সবিনয়ে সকলের প্রস্তাব নাকচ করেছিল— 'না, এখন আর অভিনয় নয় এখন ওকে পড়াশুনা করতে হবে। লেখাপড়া শেষ হলে আপনাদের সঙ্গে কাজ করবে না

হয়। এখন ওকে একটু সময় দিন।'— তিন বছর কোনো ডাকে সাড়া না দিয়ে মেয়েকে টুয়েলভ ক্লাশ আই এস সি পাশ করিয়ে কলেজে ভর্তি করেছে অজিত। সেই সময় শান্তনু ঘোষের কাছ থেকে একদিন ফোন এলো— 'মি: মুখার্জী, বোম্বে থেকে রুস্তমভাই প্যাটেলের ডাক এসেছে। আমাকে ফোন করেছিলেন। ওঁর নতুন ছবির জন্য দেবাঙ্গনাকে চাইছেন। যোগাযোগ করে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। ছবির স্ক্রীপ্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেটুকু দিলেন সেইটুকুতেই বুঝেছি দারুণ কাহিনি। হিন্দি সিনেমায় সোনার প্রথম পদক্ষেপ রুস্তমজীর মতো লেজেন্ডারি পরিচালকের হাত ধরেই ঘটুক— কী বলেন?'

অজিতের বলার কী আছে? শান্তনু ঘোষ রাজি হয়েছেন মানেই সোনার জীবনে আবার ভাল সুযোগ এসেছে। রুস্তমভাই প্যাটেলের নামই হয়ে গেছে— 'সুপার হিট ডাইরেক্টার।' তিনি দেবাঙ্গনাকে নায়িকা করতে ইচ্ছুক এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে? অজিত ফোনের এপাশ থেকে বলেছিল — 'আপনি সোনার অভিনয় জীবনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি যা বলবেন সেটাই সোনা শিরোধার্য করবে। পড়াশুনোয় একটু বাধা আসবে বটে, তবু মেয়েটা এগিয়ে যাক।'

শ্যুটিং স্টার পূর্বাকাশ থেকে পশ্চিমাকাশে এসে পৌঁছে গিয়েছিল উনিশ বছর বয়সে। অজিত মুখোপাধ্যায়ের মেয়েকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অবশ্য কলেজ কোর্স কমপ্লিট করে গ্র্যাজুয়েট হতে পারেনি ও, তাতে কী? ওইটুকু বয়সে যে মেয়ে সাফল্যের শিখরে চড়তে পেরেছে বি এ পাশের একটা ডিগ্রির ওর কাছে এমন আর কী দরকার? রুস্তমজীর ছবিটা আর্ট ফিল্ম নয়, আর্ট ফিল্ম টাইপের কমার্শিয়াল মুভি ছিল। বক্স অফিস হিট করে সুপারহিট হয়েছিল। দেবাঙ্গনাও বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মোস্ট ওয়ান্টেড হিরোইন বনে গেল। শান্তনু ঘোষের মতো রুস্তমভাই প্যাটেলও নম্র চরিত্রের মেয়েটিকে কন্যাস্নেহে ভালবেসে ফেললেন। দীর্ঘ এগারো মাস শ্যুটিং চলেছে, স্টুডিও সেটে কিংবা আউটডোরে নানাসময় নানা অসুবিধায় পড়তেই হয়। নায়ক-নায়িকারা সামান্য নাম করে ফেললেই নিজেদের স্টার বলে ভাবতে থাকে আর সামান্যতম ডিস্‌কমফোর্ট হলেই কলাকুশলীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, ঔদ্ধত্য দেখায়। কিন্তু দেবাঙ্গনা হাজারবার অসুবিধার মধ্যে পড়েও কোনো নালিশ করেনি, কারও সঙ্গে কড়া ভাষায় কথা বলেনি। উল্টে কলাকুশলীদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। যে জন্য টিমের প্রত্যেকের কাছে ও অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হতে পেরেছে। এসব কথা স্বয়ং রুস্তমজী অজিতকে বলেছিলেন— 'আরে বাহ! ক্যা শিকসা, ক্যা সংস্কার আপনে অপনী বেটি কো দিয়া মুখার্জী, য়্যাসা পহলে কিসী ভী হিরোইন মে দেখা নহী। বুজুর্গ কো ক্যায়সে ইজ্জত করনা হোতা হ্যায়, কোঈ তো দেবাঙ্গনা সে শিখেঁ। বড়ী অচ্ছি লড়কি হ্যায় আপ কী বেটি।'— অজিতের বুক ফুলে উঠেছিল। তখন উনি প্রায়ই মেয়ের কাছে চলে যেতেন। মেয়ের শ্যুটিং দেখতে যেতেন, পার্টি থাকলে ওখানে তো কথাই নেই। পয়সা খরচা করে কয়েক প্রস্থ ভালো পোশাক তৈরি করেছেন ওখানে পরার জন্য। তখন শুধু সুখ আর সুখ, মন প্রশান্তিতে পূর্ণ। শ্রাবণীরও একই রকম। তাই সংসারেও শান্তি থাকছে, খিটিমিটি কোন জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে। সোনাও দেখতে দেখতে একুশ বছরের হয়ে গেল। ব্যস্ত নায়িকা। নিজে সব সামলানো সম্ভব নয়, সেক্রেটারি সামলায়। ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে দামি হিরোইন। ওর রেট শুনে অজিতের মধ্যবিত্ত হৃদপিণ্ড ছলাৎ করে লাফিয়ে ওঠে। স্বপ্নেও এত টাকা দেখার সাহস হতো না ওর। — সবকিছু কল্পনাতীত ভাল চলছিল। হঠাৎ করে ওলোট-পালট হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সাধের প্রাসাদ।

রুস্তমভাই প্যাটেলের দেওয়া পার্টিতে অজিত প্রথম দেখেছিল সাইরাসকে। বোম্বে ফিল্মের তাবড় হস্তিরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। অজিত বোম্বে এসেছে শুনে সোনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন রুস্তমজী— 'বাবাকে নিয়ে এসো দেবাঙ্গনা। বলো আমি নেওতা দিয়েছি। না এলে দুঃখ পাবে।'— ওসব স্থানে কুরূপ চোখে পড়ে না, সকলেই সাজে-সজ্জায় মোটামুটি সুন্দর দেখতে লাগে। সোনা-অজিতরা তো জন্মগত সুন্দর। ওরা সৌন্দর্যের আলাদা ক্যাটেগোরিতে পড়ে। সেই রাতে ঐ পার্টিতে 'আলাদা ক্যাটেগোরির' আর এক রূপবান পুরুষকে দেখে অজিত ভেবেছিলেন নতুন হিরো হবে হয়তো। একটু পরে দেখলেন রুস্তমজী ছেলেটিকে ডেকে সোনার সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছেন। তারপর আরও ক'জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে অজিতের সোফার সামনে এসে বললেন,— 'মুখার্জী, দিস ইজ মাই নেফিউ সাইরাস জাভেরি। হি ইজ ফার্স্ট অফিসার অব মার্চেন্ট নেভি। সাইরাস, হি ইজ মি: মুখার্জী, দেবাঙ্গনা'স ফাদার।' ভালোমতন শক্ত গ্রিপ ছিল সাইরাসের হ্যান্ডশেকে। অজিতের হাতের চেটো টনটন করেছে। সমুদ্র,

With Best Compliments From -

Willowood Chemicals Private Limited

MK Point
AT 27, BENTINCK STREET,KOLKATA

AGRAWAL & AGRAWAL
Architects Planners Interior Designer

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By
M K GROUP
Contact no. 033-32901999
www.mkpoint.in

মাসের পর মাস জলে থাকা নিয়ে অল্পই কথা হয়েছে। দারুণ ম্যানলি এক্সট্রীম হ্যান্ডসাম স্মার্ট ইয়ংম্যানকে ভাল লেগেছিল। সেদিন ভাবতেও পারেননি এই ছেলে ওদের জামাই হবে। সেই পার্টির রাতের পর এক বছরের মধ্যে সোনার মুখে কোনোদিন সাইরাস জাভেরির নামও উচ্চারণ হতে শোনেননি। যখন শুনলেন তখন আর কিছু করার ছিল না। মেনে নিতে পারেননি ওরা। পার্শী মানে মুসলমানই। হতে পারে ইসলাম ওদের ধর্ম নয়, তবুও পারস্যের লোক তো মুসলমানই। বাঙালি মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে পার্শী জামাইকে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করাবেন? অনেক যুক্তি তর্ক করে সোনাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কাজে লাগেনি। এযুগে সমাজপতিরা নেই বটে, কিন্তু সমাজব্যবস্থা এখনও মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে মেনে নেবার মতো উদারপন্থী হয়ে যায়নি। অজিত-শ্রাবণী নিজেরাই এই একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে উদার নন, তো আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে উদারতা আশা করবেন কেন? শ্রীষ বলেছিল— 'আর একবার ভেবে দেখ। আজকাল তো খৃস্টান, শিখদের সঙ্গে বিয়ে সমাজ মেনে নিচ্ছে, পার্শীরা তো আল্লা হো আকবর করে না, যদিও ওদের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না, তবে লক্ষ্য করেছি ওদের নামগুলো হিন্দু নামও হয়, মুসলমান নামও হয়, দ্যাখ না টাটাদের, জামশেদজী টাটার নাতি-পুতিদের দ্যাখ, ওবেরয় ফ্যামিলিকে দ্যাখ.... আরও আছে অনেক। ওরা মুসলমান নেই আর, তা না হলে রতন টাটা, সুদর্শন কার্পেন্টার, বিজয় মার্চেন্ট নাম হতে পারে? ভারতবর্ষের ইকনমি পিলারের মতো ধরে আছে পার্শীরা, অথচ কোনো হামবড়া হাঁকডাক নেই। আজ অব্দি কোনোদিন পার্শীদের কোনো রকমের গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়তে দেখেছিস? যা, সারা দেশ ঘুরে দেখে আয়গে পার্শীদের মতো সুসভ্য জাতি, শান্তিপ্রিয় মানুষ কোথাও পাবি না। ওদের মধ্যে দারিদ্র্য নেই, তাই করাপশনও নেই। ওরা ঝগড়া-মারামারি করতেও জানে না। কারণ আমাদের মতো পরশ্রীকাতরতা নেই ওদের। তোর মতো মুখুটি বামুন আর আমার মতো কুলীন কায়েতের উচিত ওদের চরণামৃত পান করা, তাহলে যদি সংকীর্ণমনস্কতা একটুখানি কমে আমাদের। ... যাক গে! একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করার আগে এই অধমের বলা কথাগুলো ভেবে দেখিস।'— শ্রীষ উঠে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অজিত-শ্রাবণী নিজেদের মন আর মত কোনোটাই বদলাতে পারেনি। সোনা সাইরাসকে বিয়ে করেছিল। খবর পান সোনা খুব সুখী, মেয়ে হয়েছে সোনার। শুনে ভাল লাগে আবার কষ্টও হয়। সবই আছে ওদের দু'জনের নাগালের বাইরে। ওরা না দেখতে পান, না ছুঁতে পান; নাতনিকে ঘাঁটার আনন্দ থেকে বঞ্চিত স্বনির্বাসনে নির্বাসিত দু'জন একা মানুষ। ভগবান যখন দিলেন তখন যেমন উজাড় করে দিয়েছিলেন তেমনি যখন ফেরত নিলেন তখন নিঃস্ব করে নিয়ে নিলেন। সেলিব্রেটিদের খবর গোপন থাকে না, পত্রপত্রিকার গসিপ কলাম জুড়ে পার্শী বিজনেসম্যান প্রয়াত ফিরোজ জাভেরির একমাত্র পুত্র সাইরাস জাভেরির সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত অভিনেত্রী দেবাঙ্গনা মুখোপাধ্যায়ের প্রেম এবং পরিণয়ের উপাখ্যান রঙ্গিন সচিত্র গল্প হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে অজিত-শ্রাবণীর অসম্মতির কথা, মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের কথা। এককথায় ওদের হাঁড়ির খবরে বাজার মাত হয়ে এখন অজিত 'পুনর্মুষিক ভব' দশায় ফেরত এসেছেন, সকলেই কেমন যেন করুণার দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে। এত হিউমিলিয়েটেড লাগে যে মনে হয় মাঝখানের ক'টা মাত্র বছর জীবনে না আসলেই ভাল হতো। অন্তত পাবলিকের কাছে হাস্যাস্পদ তো হতে হতো না। শ্রীষ মেনে নিতে বলেছিল। বললেই মেনে নেওয়া যায় না সবসময়। দেশের বাড়িতে জ্যাঠামশাইরা এখনও গ্রামীণ। প্রতিবছর সেখানে পারিবারিক দুর্গাপুজো হয়। মেনে নিলে দেড়শো বছরের বাড়ির পুজোতে কি যাবার মতো মুখ থাকত? বেয়াই মশাইয়ের নাম 'ফিরোজ' শুনলেই জ্যাঠামশাই নিজে ওদের পরিবারচ্যুত করতেন। সোনা তো বাবা-মাকে বিট্রে করলো। ও জানত কত গোঁড়া আত্মীয়-স্বজনরা। একমাত্র সন্তান বলে বেআক্কেলে দাবি কেন মেনে নিতে হবে? শুধু ওর আবদার রাখার জন্য অন্য সব রক্তের সম্পর্ক কেন ত্যাগ করতে হবে? যা করেছি বেশ করেছি। লোককে দেখিয়ে দিয়েছিল অজিত মুখোপাধ্যায় একমাত্র মেয়ের অন্যায় ক্ষমা করেনি। হতাশায় বিধ্বস্ত অজিত নিজের সঙ্গে এভাবে যুক্তি-তর্ক করে বোঝাপড়া করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন। আর শ্রাবণী প্রায় মূক-বধির।

কিউরিও শপ-এ দেওর আনন্দর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে সময়টা খুব ভাল কেটেছিল। ফেরার পথে গাড়িতে বসে শিরিণের কথা ভাবছিল আর মুখখানা স্মিত হয়ে উঠছিল দেবাঙ্গনার। এই সেই শিরিণ যাকে নিয়ে মিস

গোমস-য়ের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। দেখতে দেখতে ষোলো বছরের হলো। কখন যে এত বড় হয়ে গেল মেয়ে ও বুঝতেও পারেনি। এখনও বাড়িতে কথা কম বলে, বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে কথা-টথা বলে নিশ্চয়ই তা না হলে ফ্রেন্ডশিপ কী করে হলো? তাও আবার শুধু মেয়েরা নয়, স্কুলের বাইরের ছেলেবন্ধুও হয়েছে। সাইরাস প্রত্যেকবার এসে মেয়েকে আরও বড় হয়ে যেতে দেখে বলে— 'এরপর কোনো বার এসে হয়ত দেখব আমার মেয়ে একজন লেডি-র মতো লম্বা-চওড়া হয়ে গেছে, ওকে চেনাই যাচ্ছে না।'

দেবাঙ্গনা বলেছিল— 'আমাদের মেয়ে লম্বায় নিজের সমবয়সীদের মাথা ছাড়িয়ে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা দুজনেই যে বেশি লম্বা। আর চিনতে না পারারও কারণ নেই। ও তোমার মতো হয়েছে দেখতে।'

— 'আমার থেকেও ভাল হয়েছে দেখতে, কারণ ও তোমার মাথার চুলটা পেয়েছে। আমাদের পার্শী মেয়েরা চুল, কাঁধের নীচে নামতে দেয় না। তুমি যে ওদের দেখে নিজের চুল শিরিণের চুল কেটে ফেলোনি সেটাই বাঁচা গেছে। পার্শীকে বিয়ে করেছ বলে নিজেকে পুরোপুরি পার্শী বানিয়ে ফেলার চেষ্টার তো অন্ত নেই তোমার। জীবনে দুটি কাজ তুমি সর্বান্তঃকরণে করেছ। এক নম্বর— অভিনয়। আর দু-নম্বর হলো আমার যেখানে যত আত্মীয় আছে তাদের খুশি রাখার জন্য মন জুগিয়ে চলা। দু-নম্বর কাজটা করার খাতিরে আমার প্রিয় এই চুলের গোছা কেটে ফেলোনি বলে আমি কৃতজ্ঞ।'

— 'চুল আমি কখনোই কাটতাম না। শান্তনুকাকুকে কথা দিয়েছিলাম বলিনি তোমাকে? শিরিণকেও কাটতে দেব না। এ্যাই, তুমি কি আমার মাথার চুলকে ভালবেসেছিলে নাকি আমাকে?'

— 'বোকার মতো প্রশ্ন। চুলটা তো তোমারই, তোমাকে ভালবাসলে ওটাকেও ভালবাসা হয়। কান ধরে টানলে মাথা আসে, জানো না? তেমনি তোমাকে টেনে কাছে আনলে চুলের রাশি আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। একবার দেখাই?'

— 'না। যখন তখন দেখানো ভাল লক্ষণ নয়। সাইরাস, আমি কি সত্যিই পার্শী সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ করতে পেরেছি, তোমার রিলেটিভদের মনের মতো বৌ হতে পেরেছি? তোমার বাবা-মা নেই, ওঁরাই তোমার আপনজন বলেছিলে তুমি। তোমার বাবা-মা থাকলে অত ভাবতাম না, কারণ আমার ত্রুটি বিচ্যুতি ওঁরাই ঢেকে রাখতেন। কিন্তু পিসি, মাসি, মামা-মামি-কাকা-কাকি এঁদের তো বিয়েতে আপত্তি ছিল, রুস্তমজী বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।'

— 'কোনো ভয় নেই অঙ্গনা! ওরা সবাই এখন খুব খুশি। তুমি তোমার ব্যবহারে ওদের জয় করে নিয়েছ। আমি থাকতে ভয় পাবে কেন? এখনও কোনো দোষ করনি, যদি কখনও দোষ-ত্রুটি হয়েও যায় আমি ঢেকে দেব।'

এই হলো সাইরাস। রুস্তমজীর দেওয়া পার্টিতে উনিশ বছর আগে প্রথম দেখা হওয়ার দিন থেকেই দুজনের ম্যাগনেটিক আকর্ষণ হয়েছিল একে অন্যের প্রতি। তখন দু-মাসের ছুটিতে এসেছিল, তাই রোজ দেখা হতো। চলে যাবার পর যখন যে বন্দরে নোঙ্গর করেছে, সেখান থেকে ফোন করেছে, সারারাত কথা বলেছে ওরা, ভোরের দিকে দু-ঘণ্টা ঘুমিয়েছে দেবাঙ্গনা। একবছর অনুরাগ পর্ব চলার পর সাইরাস 'প্রপোজ' করেছিল। দেবাঙ্গনা এই মুহূর্তটার জন্যই তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে ছিল। বিয়ে হলো। তারপর সাইরাসের জাহাজে সমুদ্রযাত্রা। অর্ধেকের বেশি পৃথিবী ভ্রমণ, দুমাস ধরে জলে ভেসে দুলেদুলে চলা আর চলা। প্রথম কয়েকদিন সি-সিকনেসের গা-গুলানো, বমি, মাথা ঘোরায় একেবারে চিৎপাত। ডাক্তারের অবজারভেশনে থাকা, তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। সাইরাস সঙ্গে না থাকলে ও কিছুতেই সমুদ্রে এতদিন থাকতে পারত না। অসম্ভব ব্যাপার! মাথার ওপর আকাশ আর নীচে জল— উফ্, কী ভয়ঙ্কর বোরিং! কিন্তু সাইরাস আর অন্য অফিসাররা প্রতি মুহূর্ত সঙ্গ দিয়ে ওর মনোবল চাঙ্গা করে রেখেছিল। এমন হানিমুন ক'জনের জীবনে ঘটে জানা নেই, কিন্তু বিয়ের আঠারো বছর পরে আজও ওর মনে হয়— এই তো সেদিন সমুদ্রে গিয়েছিলাম। সমুদ্রে ও আবার যাবে, এবার শিরিণকে নিয়ে ওর আই সি এস ই পরীক্ষার পর। ততদিনে উদয়ভানুজীর ফিল্ম শেষ হয়ে যাবে। ও নিজেও ঝাড়া হাত-পা হয়ে এই রঙিন জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নেবে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতেই বছরে একেবারে বাছাই করা একটার বেশি ফিল্মের কনট্রাক্ট নিচ্ছে না ও। ডায়েটিশিয়ানের দেওয়া মাপমতো খাবার আর জাপানিজ বিউটিশিয়ানের তত্ত্বাবধানে থাকা যত্নের শরীর পঁয়ত্রিশেও পঁচিশের বেশি মনে হতো না। আর এখন ঊনচল্লিশেও ঊনত্রিশের বেশি মনে হয় না। গ্ল্যামার এতটুকুও কমেনি তাই অফারও আসে। কিন্তু নিজে তো

জানে মেঘে মেঘে বেলা বেড়েছে কেউ বুঝতে পারেনি। সময় থাকতে নিজের স্টার পরিচয়ের মর্যাদা বজায় রেখে সরে যেতে চায় ও। একজন সুপার স্টার মরার আগের দিন অব্দি মা, পিসি, ঠাকুমা-দিদিমার সাইড রোলে অভিনয় করবে এটা ভাবতেও খুব খারাপ লাগে। উদয়ভানুর এই ছবিই ও রাজি হচ্ছিল না নিতে, কিন্তু উদয়জীর বারবার করা অনুরোধ বারবার রিফিউজ করতেও খারাপ লেগেছে। স্ক্রীপ্ট পড়ে যখন দেখলো কাহিনি এক রাজনৈতিক নেত্রীর লড়াইকে কেন্দ্র করে এবং নেত্রীর বয়স চল্লিশের বেশি তখন রাজি হয়েছিল। কলকাতায় থাকতে বাবার মুখে একটা কথা অনেকবার শুনেছে ও — 'দেহতট সনে নট সকলি হারায়।'— ওর দেহতট নষ্ট হবার অনেক আগেই নিজের ইমেজ বজায় রেখে রিটায়ার করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে দেবাঙ্গনা। এরপর নিজেকে সংসারে জড়াতে চায়, শিরিণ আর সাইরাসকে জীবনের বাকি সময় উজাড় করে দিতে চায়। শিরিণের এডুকেশন, ফিউচার গড়ে তোলার পালা এখন, সেই কাজেই নিবিষ্ট হতে চায়। চলচ্চিত্র জগৎ ছেড়ে এলেও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয়ে ওর নাম খোদাই হয় গেছে। তাই দেবাঙ্গনা জাভেরি মৃত্যুর পরেও বহুকাল বেঁচে থাকবে মানুষের স্মৃতিতে এই বিশ্বাস আছে ওর।

বাড়ি ঢুকতেই চিন্তান্বিত মিস গোমস জানালেন— 'শিরিণ হ্যাজ নট রিটার্নড ফ্রম স্কুল মিসেস জাভেরি। ইটস্ অলমোস্ট সেভেন। শি ওয়াজ নেভার লেট বিফোর.. আই এ্যাম এ লিট্‌ল ওয়ারিড... শ্যাল আই গো টু আস্ক আদার গার্লস।'

— 'নো মিস গোমস। আই নো হোয়ার শি হ্যাজ গন। চিন্তা করে নিজের শরীর খারাপ করবেন না, ও এসে পড়বে।'

পৌনে আটটায় অটোতে চেপে শিরিণ বাড়ি ফিরেই অপরাধী মুখ করে বলেছিল— 'সরি মম, সরি অ্যানি ম্যাডাম, আই কেপ্ট ইউ অয়েটিং... আই ওয়াজ উইথ মাই ফ্রেন্ডস্...'

দেবাঙ্গনা বলল, 'ঠিক আছে। তবে এরপর বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও গেলে জানিয়ে দেবে বাড়িতে। আর এত দেরি করবে না। এখন গিয়ে স্কুল ড্রেস ছেড়ে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে যাও।' — তখনকার মতো একটা প্রশ্নও করেনি।

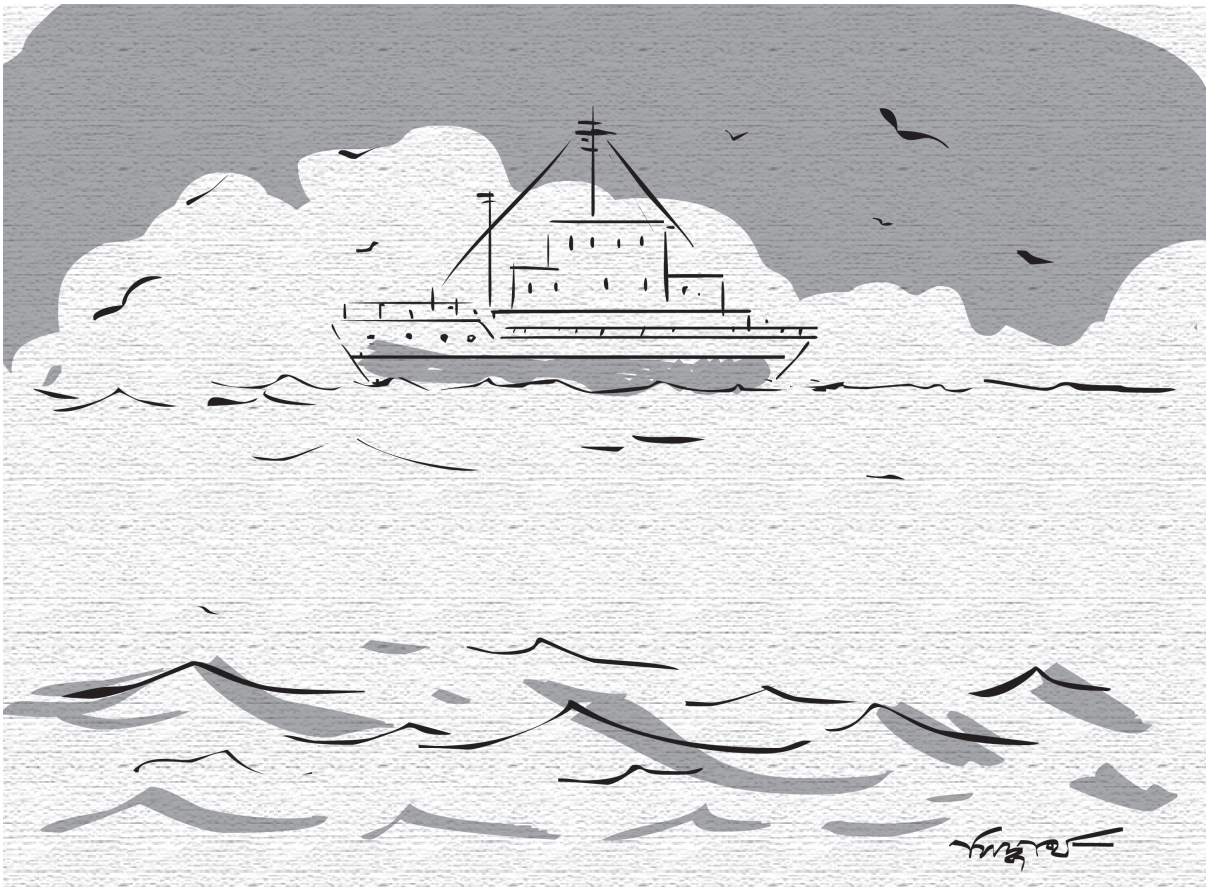

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher

SMALL INVESTMENT TO FULFILL OUR FINANCIAL GOALS.....

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

INSTITUTE OF
INTERNATIONAL TRADE
(A college affiliated with MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MAKAUT))

COURSES OFFERED

Bachelor of Business Administration (MAKAUT)
Post Graduate Program In Management (PGPM)
International Trade Management (CITM)
International Taxation (Online)
Capital Market (National Stock Exchange)

AFFILIATIONS

NSE

Campus: EN - 27, Salt Lake City; Sector 5,Kolkata - 700 091
Regd. Office: 6 Waterloo Street, Suite # 504, Kolkata-700069
Phone: 033-3056-6049 | **Email:** Info@iitrade.ac.in | **Web:** www.iitrade.ac.in

খাবার টেবিলে করবে, দেখবে শিরিণ সত্যিকথা বলছে কিনা।

শিরিণ সত্যি কথা বলেছিল। ক্লাশের বন্ধু মনীষা আর মনীষার দুই বন্ধু দীপক খারে আর সিভাস বেঞ্জামিনের সঙ্গে ছিল এতক্ষণ। ওরা তিনজন বাসে করে ওকে নিয়ে এসে মেন রোডে নামিয়ে অটোতে তুলে দিয়েছিল ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের ভেতরে আসার জন্য। অটো পেতে দেরি হলো বলে আরও দেরি হয়ে গেল— দেবাঙ্গনা জানে বান্দ্রার মতো জায়গায় বিশেষ করে ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের মতো পশ এলাকায় সকালে মেডসার্ভেন্টরা যখন ওদের বাঁধা অটোয় করে ঝাঁক বেঁধে এসে নামে তখনই একমাত্র সময় ফেরত যাওয়া খালি অটো পাওয়া যায়। বিকেল পাঁচটায় সেই অটোগুলো এসে দাঁড়িয়ে থাকে বাঁধা সওয়ারিদের অপেক্ষায়। অন্য কাউকে তোলে না। সন্ধ্যে সাতটার পর এই রাস্তায় অটো পাওয়া খুবই মুশকিল। ও জিজ্ঞেস করল— 'বাসে করে এলে কেন? ওদের নিয়ে বাড়ি অব্দি রিটার্ন ট্যাক্সি নিতে পারতে, তাহলে ঝামেলা হতো না। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আবার বাসে করে ওদের বাড়ি ফিরতে কত দেরি হবে বলো তো?'

শিরিণ বলল, 'আমি জানতাম না মম যে মনীষা আজ স্কুলছুটির পর বাইরে কোথাও যাবার প্ল্যান করেছে। জানা থাকলে অ্যানি ম্যাডামকে বলে যেতাম, আর সঙ্গে টাকাও নিয়ে যেতাম। স্কুলে ও আমাকে বলল। আমি ছুটির পর শপ-এ গিয়ে চাচুর কাছ থেকে দু-হাজার টাকা নিয়েছি মম।'

— 'কোথায় গিয়েছিলে? তুমি তো রাস্তাও ভালো করে চেনো না।'

— 'আমরা জুহু বীচেই ছিলাম। ওরা সব রাস্তা চেনে। পায়ে হেঁটে, বাসে-ট্রেনে ঘোরে তো তাই সব চিনে ফেলেছে। দু-হাজার টাকা চারজনের খাওয়াতেই খরচ হয়ে গেছে। অটো, বাস এসবের ভাড়া ওরা দিয়েছে।'

— 'বেশ করেছ। সবাই মিলে কনট্রিবিউট করলে ফ্রেন্ডশিপ ভাল থাকে। কলকাতায় আমরাও বন্ধুরা মিলে বাসে, ট্রামে, লোকাল ট্রেনে চড়ে কত ঘুরেছি। গাড়ি ছিলই না তো! বেশিরভাগই বাসে চড়ে যেতাম তবে আগে থেকে প্ল্যান করা থাকত। যেমন চিড়িয়াখানা আর আউট্রাম ঘাট একদিনে। পরেশনাথ মন্দির আর দক্ষিণেশ্বর কালী টেম্পল একদিন বাসে করে। তারপর একদিন লোকাল ট্রেনে বেলুড়মঠ হয়ে চলে গেছি ব্যান্ডেল চার্চে। আমি জানি এভাবে বেড়ালে রাস্তা চেনা, কোন বাস কোন রুটে চলে এসব হাতের চেটোর মতো চেনা যায়। তা মনীষার বন্ধু ওই ছেলেদুটো কী করে?'

— 'ওরা দুজনেই টুয়েল্‌ভ ক্লাশে পড়ে। সিভাস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বয়েস স্কুলে আর দীপক প্রভাদেবী বয়েজ হাই স্কুলে। মম, তুমি আজ প্রথম কলকাতার কথা বললে। আমি জানি কলকাতায় আমার নানাজী-নানিজী থাকেন। আমরা কলকাতায় কেন যাই না? তুমি নানা-নানির কথা কেন বল না কখনো?'

দেবাঙ্গনা মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। হঠাৎ করে মুখ দিয়ে নিজের কিশোরীবেলার কথা বেরিয়ে পড়েছে। এখন কী উত্তর দেবে শিরিণকে। শিরিণ মিথ্যে কথা বলে না, ও কী করে মিথ্যে কথা বলবে মেয়ের কাছে? ষোল বছর পর জানতে চেয়েছে নিজের অধিকার বলে, এখন ওকে বলতেই হবে। বললও।

সব শুনল শিরিণ। মা-র বলা শেষ হলে প্রশ্ন করল — 'হিন্দুইজম কী? ব্রাহ্মণ কী? জোরাসট্রিয়ানিজম কী? হিন্দু ব্রাহ্মণ বাঙালি মা আর জোরাসট্রিয়ান পার্শী বাবার মেয়ে হিসেবে আমার পরিচয় তাহলে কী হবে?'

দেবাঙ্গনা বলল, 'এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার নিজেরই ভাল করে জানা নেই, বিশ্বাস কর। শুধু এটুকু বলতে পারি যে হিন্দুরা মূর্তির মাধ্যমে পুজো করে, প্রত্যেক মেল-ফিমেল দেবতার আলাদা আলাদা রূপ বা চেহারা নিয়ে মূর্তি হয়। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের একটা শ্রেণী যা অনেক আগে মানুষ সমাজ তৈরি করার সময় বানিয়েছিল। হিন্দুরা ভারতবর্ষের মানুষ, অনেক গডস্ অ্যান্ড গডেসেস-এর পুজো করে। আর পার্শীরা পারস্য এখন যাকে ইরান বলে সেখানকার মানুষ। ইরান থেকে অনেক অনেক শো বছর আগে ভারতে এসেছিল। ওরা সিঙ্গল গডের পুজো করে যার নাম 'আহুরা মাজদা'। ওরা তিনটে এলিমেন্টকেও পুজো করে— মাটি, জল আর আগুন। আগুন সবকিছু পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয় বলে আগুনকে ওরা সবচেয়ে পবিত্র সবচেয়ে শুদ্ধ এলিমেন্ট বলে মানে, তাই ওদের একমাত্র মন্দিরের নাম 'ফায়ার টেম্পল'। সত্য কথা, বিনয় ভাব, আর সহমর্মিতা ওদের ধর্মের মূল কথা। — শিরিণ, তোমার ড্যাড এই মূল কথায় বিশ্বাসী বলেই আমি ওকে ভালবেসেছি, বিয়ে করেছি, জোরাসট্রিয়ান ধর্মে কনভার্ট হয়ে পার্শী হয়েছি। আমি আর ব্রাহ্মণ নই, তাই তুমি পার্শী বাবা-মার পার্শী মেয়ে বলেই জগতে পরিচিত হবে।'

— 'মম, নানা-নানির কাছে আমি যদি যাই কখনো ওঁরা

আমাকেও তাড়িয়ে দেবেন?'

দেবাঙ্গনার চোখে জল এসে যায়। বলে— 'জানি না শিরিণ। অনেকেই জানে না বলে আমাদের মুসলমান বলে ভাবে, আমার বাবা-মাও তাই ভেবেছিলেন। তুমি বড় হয়ে গিয়ে দেখতে পারো ওরা তোমাকে গ্রহণ করেন কিনা।'

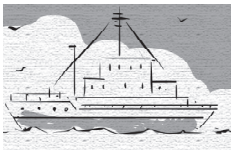

অজিত বাড়িতে এখন একা। অবসরপ্রাপ্ত মানুষের অখণ্ড সময় আর কাটতে চায় না ওঁর। শ্রাবণীর এখনও দু-বছর বাকি আছে। ও দশটার আগেই বেরিয়ে যায়, তারপর থেকে অজিতের অবস্থাটা বোবা মানুষের মতো। শ্রীষ এখনও আসে। একদিন শ্রীষ একটা বই নিয়ে এলো— 'দ্যা ইন্ডিয়ান পার্শীজ'। বইটা বন্ধুকে দিয়ে বলল, 'আমি পড়ে তোর জন্য এটা নিয়ে এলাম। পড়ে দ্যাখ। সময় তো কাটবে আর যা জানিস না, সেসব জানতেও পারবি।'

— 'কোত্থেকে জোগাড় করলি?'

— 'ছেলের কাছে সুরাটে যখন গিয়েছিলাম তখন একটা বুকস্টলে পেলাম। একশো পাতার বই দেখে কিনে ফেললাম। চোখে ভাল দেখতে পাই না, মোটা বই হলে হয়ত কিনতুমই না। ডান চোখের ছানিটা এবার লেজার করবে, বাঁ চোখেরটা ছ-মাস পরে হবে। চোখ নিয়ে পড়তে খুবই অসুবিধা হয়েছে, সময় লেগেছে, তবু কোনোমতে পড়ে শেষ করেছি। কত ভুল ধারণাই না করেছিলি অজিত। নিজে পড়ে এবার বিশ্বাস কর মুসলমান না অন্য কিছু।'

অজিত বইটা খুলে দেখার উৎসাহও পাচ্ছেন না। কুড়ি বছর পর এখন আর জেনেই বা কী লাভ? আজকাল পত্রিকার সিনেমা পাতায় সোনাকে দেখা যায় না। দলে দলে আসা নতুন নায়ক-নায়িকার ভিড়ে দেবাঙ্গনা জাভেরি হারিয়ে গেছে। একেবারে প্রথমদিকে খবর পেতেন। বোম্বেতে পরিচয় হওয়া বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, যোগাযোগ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সরে গেছে, তাই সোনা, সোনার মেয়ে কারও খবর জানা যায়নি অনেকদিন। মেয়ে ফিল্ম করা ছেড়ে দিয়েছে এটা বুঝতে পেরেছেন। ভালই করেছে। বয়স চল্লিশ পার করার পর মান-ইজ্জত খুইয়ে পড়ে না থেকে ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে। নাতনিও আঠারো বছরের হলো। চোখের দেখাও দেখলেন না ওকে! কতবার ভেবেছেন অজিত ওদের নিয়ে আর ভাববেন না, পারছেন কই? দমবন্ধ করা একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে ওদের ভাবনা মনের মধ্যে শিকড় বিছিয়ে অবসেশনে ভোগাচ্ছে তাঁকে। শুতে-জাগতে প্রতিক্ষণ সোনা যেন ওঁর চারপাশে ছায়ার মতো লেগে আছে, কিছুতেই সরাতে পারেন না ওকে।

অর্ধেক পড়া খবরের কাগজ 'দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া'র উড়ে যাওয়া পাতাগুলো খাটের তলা, টেবিলের তলা থেকে বের করে পেজনম্বর মিলিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আবার পড়তে বসেন। এই আর এক নতুন শব্দ সংকলন হয়েছে আজকাল— 'রেভ পার্টি'। বড়লোক বাপেদের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র-কন্যারা কোনো হলে একত্র হয়ে ড্রাগ-ড্রিঙ্কস নিয়ে উত্তেজিত মিউজিকের তালে তালে উদ্দাম নৃত্যে মত্ত হচ্ছে। পরপর কয়েকবার পুণা শহরে পুলিশ রেইড করে ধরেছে এদের। বয়স ষোলো থেকে পঁচিশ, সংখ্যায় একঝাঁকে সত্তর থেকে একশো। আজকের কাগজে দিয়েছে মুম্বাইতে রেইড করে প্রায় দেড়শোর একঝাঁককে অ্যারেস্ট করেছে রেভ পার্টি থেকে। বেশ করে আড়ংধোলাই দেওয়া উচিত। তাহলেই ওদের উত্তেজনার গরম কমবে। কিন্তু তা তো হবে না। ইনফ্লুয়েনসিয়েল বাপ-মা'রা দৌড়ে এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে, যাতে আরও অধঃপাতে যায়, সমাজটাকে আরও নোংরা করতে পারে সেজন্য।

... সোনার মেয়েটাও আঠারোয়! ও এসবের মধ্যে নেই তো? ত্যাগ করে দিলেই কি আর পর হয়ে যায়?

—অজিতের বুকের ভেতর অজানা আশঙ্কার পায়ের আওয়াজ হতে থাকে। শুনেছিলেন নাতনির নাম রেখেছে শিরিণ। আঁতিপাতি করে খবরটাতে নাম খোঁজেন অজিত। নাহ! কারো নাম দেয়নি, শুধু জামা তুলে মুখঢাকা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠার ছবি দিয়েছে।

মিস্ অ্যানি গোমসের মাথার সামনের সব চুল এখন পাকা। একটু মুটিয়েছেন বয়সের সঙ্গে মিলজুল রেখে। মিসেস জাভেরি ওঁর জন্য হেলথ ইনসিওর করে রেখেছেন কিন্তু এখনও অব্দি সেটার ব্যবহার হয়নি। অ্যানির বয়সকালীন হয়ে থাকে এমন কোনো রোগ নেই। ওঁর মনের প্রফুল্লতা শরীরকে সুস্থ রেখেছে। শিরিণকে নিয়ে আর কোনো ভাবনা, কোনো উদ্বেগ নেই এখন। সেই কবে ওরা রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিসেস জাভেরির আউটডোর শ্যুটিংয়ের সুবাদে। সেখান থেকেই অ্যানির দূরদর্শিতা প্রমাণ করে মা-মেয়ে কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল

মাত্র পনেরোদিনে। মা-র সঙ্গে শোওয়া, মা-র হাতে খাওয়া, শিরিণের বুভুক্ষু মনে এত রসদ জুগিয়েছিল যে ফিরে আসার পর অনেক সময় মাকে না পেলেও আগের মতো গোমড়া মুখে বাড়িতে থাকার স্বভাবটাই বদলে গিয়েছিল। শ্যুটিং অ্যাকটিং চোখে দেখে বুঝেছে ওর মা কী কারণে ব্যস্ত থাকে, কেন ওকে সময় দিতে পারে না। মা-মেয়ের সম্পর্কের স্বাভাবিক ব্যঞ্জনার প্রকাশ তখন থেকেই ঘটেছিল। আর এখন তো কথাই নেই। বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই, মুখে মেঘের ছায়াও দেখা যায় না। সদা হাসিখুশি উজ্জ্বল উচ্ছ্বল মেয়ে অ্যানির শিরিণবেবি। মিসেস জাভেরি অভিনয় থেকে রিটায়ার করেছেন, সাইরাস স্যারও খুব শিগগির জাহাজ থেকে পাকাপাকি মাটিতে নেমে আসবে শুনছেন অ্যানি। এই বাড়িটা এবার প্রকৃত অর্থে সংসার হয়ে উঠবে। আজকাল অ্যানিকে এতবড় বাড়িতে আর একা থাকতে হয় না প্রমোদের বৌয়ের ভরসায়। মিসেস জাভেরিও বাড়িতেই থাকেন বেশিরভাগ সময়। আজ উনি নেই, কার ম্যারেজ অ্যানিভারসারি অ্যাটেন করতে গেছেন সন্ধ্যের সময়। ফিরতে রাত তো হবেই। আর শিরিণ তো বারো ক্লাশের আই এস সি পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন থেকেই সারাদিন বাড়িছাড়া। পেটভরে ব্রেকফাস্ট করে সেই যে প্রমোদ ওকে মেন গেটে ছেড়ে দিয়ে আসে তারপর সে বাসে, অটোয়, ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যে পার করে ঘরে ফিরছে। আজ তো বলেই গেছে আসতে অনেক রাত হতে পারে, চিন্তা করো না তোমরা। আজ অ্যানি একা, তাই টিভি খুলে বসেছেন ডিনার খেয়ে। ওরা না ফেরা অব্দি শুতে যাবেন না, সেটা ভাল দেখায় না। মিসেস জাভেরি অনেকবার বলেছেন, 'মিস গোমস, আপনার বয়স হয়েছে, এভাবে জেগে বসে থাকবেন না। আপনি শুয়ে পড়বেন। এতকাল ধরে এখানে কখনো চুরি হতে দেখেছেন? মেন গেট পেরিয়ে একটা স্ট্রে ডগ ঢুকতে পারে না, চোর কোথা দিয়ে আসবে?' — অ্যানি জানেন, এখানকার সিকিউরিটি কত টাফ্ যেন মিলিটারি। তবুও এতযুগ পরেও তিনি লয়েলটি ছাড়তে পারেন না।

রাত বারোটা বেজে গেছে, এখনও কারো দেখা নেই। ফোনও আসেনি। এখন অ্যানির টেনশন হচ্ছে। শিরিণের মোবাইলে দু'বার ফোন করেছেন, সুইচড্ অফ। মিসেস জাভেরিকে ফোন করা ওঁর সাজে না। অগত্যা দুশ্চিন্তা নিয়েই আবার টিভি-র সামনে। কী দেখবেন এত রাতে? লেটনাইট ইংলিশ নিউজ চ্যানেলে লাগালেন। .... আবার সেই রেভ পার্টি। এবার এখানে, কোলাবাতে। পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেছে জায়গাটা। রেইড হয়েছে বলছে নিউজ রিডার। লেডি পুলিশেরা পরপর মেয়েগুলোকে টেনে বের করে ভ্যানে তুলছে। ছেলেমেয়ে সকলেই হাস্যকর ভাবে নিজেদের জামার সামনের দিকটা টেনে মুখ ঢাকার চেষ্টায় ব্যস্ত। আরে! এই মেয়েটা কে? শিরিণ যে ড্রেস পরে বেরিয়েছে আজ, হুবহু সেরকম ড্রেস পরে আছে। শিরিণের মতই লম্বা। জামা টেনে মুখ ঢাকা, কিন্তু ভ্যানে তোলার সময় পিঠে ঝুলন্ত লম্বা বেণী! ওটাও কি শিরিণের মতো? পায়ে স্ট্র্যাপ বাঁধা পাতলা চটি... গোলাপি রংয়ের... না, না, এ হতে পারে না। ও শিরিণ নয়! অন্য কেউ। অ্যানির হঠাৎ শীত করতে থাকে, হাতপায়ের পাতা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। টিভি বন্ধ করে সোফায় শুড়ে পড়েন।

একটু ধাতস্ত হওয়ার পর ঘড়ির দিকে তাকান। ১২.৩০। ড্রেস, চটির কালার, বেণী, ফিগার সব চোখের সামনে বারবার আসছে। এত ভুল দেখবে এই চোখদুটো? এ কী করল শিরিণ? এইটুকু বয়সে পুলিশের খাতায় নাম লেখালো? ও তো উচ্ছৃঙ্খল নয়, তবে ওইরকম জায়গায় কোন উত্তেজনার খোঁজে গেল? ড্রাগ? না-না। ও ড্রাগ নিলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারত না। ভুল করে খারাপ সংসর্গে পড়েছে নিশ্চয়ই। ওর সঙ্গীরা নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু এখন মিসেস জাভেরিকে জানাতেই হবে। ... লাইন এনগেজড্।

— 'হ্যালো! স্পিক কার্জন স্পিক আপ। আই এ্যাম লিসনিং।'

— 'ম্যাডাম সামথিং সিরিয়াস হ্যাজ হ্যাপেন্ড।' কার্জন নামের ব্যক্তি দ্রুত কিছু কথা বলে গেল, দেবাঙ্গনা সব শুনল। তারপর বলল— 'ইয়েস। কামিং রাইট এ্যাওয়ে। ইউ স্টে পুট দেয়ার।'

নেমন্তন্ন বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার জন্য বিদায় নিচ্ছিল, তখনই কার্জনের ফোনটা এলো। প্রায় ছুটে এসেই গাড়িতে বসে বলল— 'কোলাবা পুলিশ স্টেশনে চলো প্রমোদ।'

প্রমোদও এখন একজন বয়স্ক মানুষ। কবে থেকে মেমসাহেবের গাড়ি চালাচ্ছে, জীবন কোনোদিন থানায় নিয়ে যেতে হয়নি ম্যাডামকে। ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল— 'পুলিশ স্টেশন? কিঁউ মেমসাব?'

— 'আমার ভীষণ বিপদ প্রমোদ, তাড়াতাড়ি চালাও। শিরিণ... শিরিণকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে।'

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

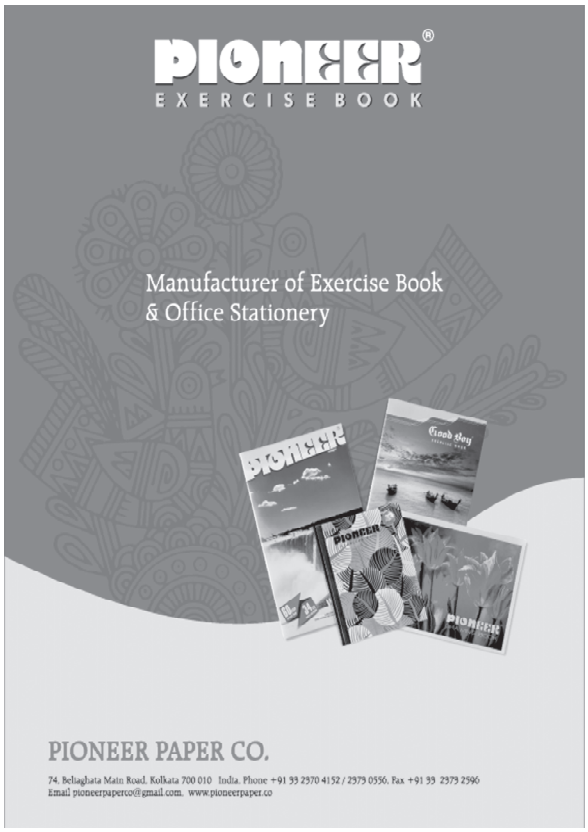

'ভারতে মাত্র একজনের মনেই এই প্রয়োজনের (ভারতীয় মনোভাবসম্পন্ন হবার) কথা প্রতিভাত হয়— তিনি মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। জনগণের প্রকৃত প্রয়োজন কী তৎক্ষণাৎ তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং অতীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ বলে অর্জিত হয়েছে তা সংরক্ষিত করার ইচ্ছা পোষণ' করেন। কেবলমাত্র গোপীলীলা এবং ভগবদ্‌গীতা (যাতে বারবার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রের কথা বর্ণিত) এই দুই আকারেই যে তিনি অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে পরিচিত তা নয়। কারণ সমগ্র মহাভারতে তাঁরই কাহিনী, তাঁরই ভক্তগণ কর্তৃক বিবৃত এবং মহাভারতের প্রথমেই ঘোষিত হয়েছে, এটি জনসাধারণের জন্য।'

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বিস্মিত প্রমোদ বলে— 'শিরিণ-বেবিকো পুলিশ নে অ্যারেস্ট কিয়া? না-না। এটা গলত খবর।'

— 'গলত নয় প্রমোদ, কার্জন ফোন করে জানিয়েছে। আমার মাথা কাজ করছে না, কী করব বুঝতে পারছি না।'

— 'মেমসাব, আপ জলদি আনন্দ সাবকো ফোন লাগাইয়ে। আমাদের আগে উনি পৌঁছে যাবে। কার্জন সাব কি ওখানে আছেন?'

—'থ্যাংক ইউ প্রমোদ। আনন্দের কথা, কারও কথাই মাথায় আসছিল না। হ্যাঁ, কার্জন আছে ওখানে।'

ওরা পৌঁছবার একটু আগেই কার্জনের ফোন এল। — 'ম্যাডাম সব ঝামেলা মিটে গেছে। চারজন উদ্যোক্তা ছাড়া বাকি সবাইকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। দেড়শো জনকে হাজতে রাখবে কোথায়? তাই কোনো জেনারেল কেস ডায়েরিও করেনি। আনন্দজী এসে পড়েছেন, উনি মিস শিরিণকে নিয়ে থানা থেকে আরও এগিয়ে যে আইসক্রীম পারলার আছে সেখানে অপেক্ষা করছেন। আপনি ওখানে নামবেন না, মিডিয়া পিপুলরা আছে ওখানে। সোজা আইসক্রিম পারলারে চলে আসুন।'

আনন্দ গাড়ির বাইরে ক্রাচ বগলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'শিরিণ খুব আপসেট। এখন ওর সঙ্গে কোনো কথা বলো না। অনেক রাত হয়েছে, এখন ওকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। কাল সকালে আমি আসব কার্জনরা আসবে। ও বডিগার্ডদের চেনে না, এখন চেনা উচিত। কাল সকালে আমরা জানতে চাইব কার সঙ্গে ও রেভ পার্টিতে গিয়েছিল। কাদের সঙ্গে এখন ও মেলামেশা করছে। ... এখন চুপচাপ বাড়ি যাও ভাবীজান। রাত্রে একটু নজর রেখো, ও যে বেশি সেনসিটিভ মেয়ে।' — শিরিণ একেবারে চুপ, গাড়িতে একটা কথাও বলেনি, বাড়ি এসেও সোজা নিজের রুমে চলে গেছে। ওরা বাড়ি ফিরেছিল প্রায় রাত দেড়টায়। অ্যানি তখনও জেগে বসে আছেন। দেবাঙ্গনা ওঁকে সব কথা বলেছিল। রাত্রে মেয়ের রুমে মেয়ের বিছানায় শুয়েছে— মেয়ে যে সারারাত ঘুমোয়নি নিজের নিদ্রাহীনতায় দেবাঙ্গনা ভাল করেই সেটা বুঝতে পেরেছে। ভোরে সাড়ে পাঁচটার পর শিরিণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন উঠে এসে এক কাপ ব্ল্যাক কফি বানিয়ে নিয়ে সামনের বারান্দায় এসে বসেছিল প্রায় একযুগ বাদে। মর্নিংওয়াকার-রা বেরিয়ে পড়েছে পথে।

কাল রাতের কথা নয়, আজকের এই সুন্দর ভোরে ওর পুরনো কথা মনে পড়ছে। সাইরাসের সঙ্গে প্রথম ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডে এই বাড়ি দেখতে আসার কথা, ওকে পাশে বসিয়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওল্ডকোর্ট বিল্ডিং, স্কুল, ওল্ড পোস্ট অফিস, প্রত্যেকটা রাস্তা-বাইলেন ঘুরে সবশেষে পেছনদিকের ঢেউ খেলানো টিলার ওপর 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'-এ নিয়ে গিয়েছিল সাইরাস। বলেছিল— 'এখানে এসে শেষ হয় আমাদের মর্টাল লাইফ অর্থাৎ নশ্বর জীবন। আমরা শুধু নিজের জন্য যেমন বাঁচি না তেমনি শুধু নিজের জন্য মরিও না অঙ্গনা। মৃত্যুর পর প্রাণহীন শরীরটাকে এখানে রেখে যাই পাখিদের খাওয়ার জন্য। বেঁচে থাকাকালীনও আমরা সাইলেন্সে বিশ্বাস করি, কলহ-অশান্তি থেকে দূরে থেকে শান্তি পেতে চাই, অন্যদের শান্তি দিতে চাই ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর পাখিরা বিনা বাধায় আমাদের মৃতদেহ পরম শান্তিতে খুঁটে খুঁটে খেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে যায়। কোনো কিছুই যেন অকারণ নষ্ট না হয়, অপচয় করে অযথা ব্যয় না করে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু যদি বেঁচে যায় যা দিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছ না, তাহলে সেই অতিরিক্তটুকু জীবজগতে অন্য কারও প্রয়োজনে বিলিয়ে দাও— এই শিক্ষা ছোটবেলা থেকে আমাদের দেওয়া হয়। এসো, এখানে বসি। Tower of silence আমাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র স্থান। তোমাকে আগেরবার এসে বলেছিলাম, আমাদের ইতিহাস, ধর্ম সবকিছু খুলে বলব, তারপর তুমি বিবেচনা করে দেখবে আমাকে বিয়ে করা যায় কিনা— মনে আছে তোমার?'

— 'মনে আছে।'

— 'বেশ। আজ এই পবিত্রস্থানে বসে বলছি মন দিয়ে শোনো। ভালবাসো বলেই দুম করে বিয়ে করে পরে পস্তানো উচিত নয়। বিয়ে মানে দুটো মানুষের জীবন আমৃত্যু সুখে-দুঃখে একসঙ্গে কাটানোর অঙ্গীকার। পরস্পরের বিশ্বাস বিবাহিত জীবনকে টিকিয়ে রাখে, সুখ-শান্তি দেয়। সেজন্য বিয়ে করার আগে জাত-পাত-ধর্ম নিয়ে ভাবনার থেকেও যাকে সারা জীবনের সঙ্গী করা হবে সেই মানুষটিকে আদ্যপান্ত ভালভাবে জেনে নেওয়া বিশেষ জরুরি।'

— 'তুমি আমাকে এই একবছরে আদ্যপান্ত জেনেছ সাইরাস? তোমার জীবনসঙ্গী হবার মতো মেয়ে বলে আমাকে মনে হচ্ছে? বছরের অধিকাংশ সময় তুমি অনেক দূরে থাকবে, আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মতো এক রঙিন ভুলভুলাইয়াতে আটকে থাকব, পারবে আমাকে বিশ্বাস

করতে?'

সাইরাস হেসে বলেছিল— 'ক্রশ এগজামিন করছ? ভালো করেছ, করা উচিত ছিল। শোনো, তোমার ব্যাপারে মামাজীর সার্টিফিকেট পেয়েছি বলে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি একথা ভেবো না। অতো দূরে থেকেও মন বোঝা যায়। ভুলে গেলে আমরা কতবার সারারাত কথা বলেছি? তুমি কেমন, তোমার এটিচিউড কেমন জেনেছি, তোমাকে ভালবেসে ভুল করিনি জানার পরই প্রপোজ করেছি। তোমাকে বিশ্বাস করতে না পারলে কাছে আসতামই না অঙ্গনা। নাবিকের স্ত্রীরা বিশ্বাসঘাতিনী হয় এরকম একটা কথা সমুদ্রে খুব প্রচলিত।' বলে হেসেছিল ও।

দেবাঙ্গনা সাইরাসের হাতের ওপর নিজের হাতখানা রেখে সিরিয়াস মুখে বলেছিল— 'আমরা একে অন্যের ওপর বিশ্বাস রাখি যখন তখন তো অন্য কোনো বাধা মানার প্রশ্নই ওঠে না। এই যে মশাই আমি আমার পাণি আপনার পাণিতে রেখেছি। এবার এই পবিত্রস্থানকে সাক্ষী রেখে আপনি আমার পাণি গ্রহণ করুন।'— বাংলায় মজা করে বলা কথাগুলো বুঝতে পারেনি সাইরাস। ও হিন্দিতে বুঝিয়ে বলেছিল তারপর। সাইরাস সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের পাতাখানা দুহাতে ধরে বলেছিল— 'ম্যায় ইস পবিত্র স্থানকো সাক্ষী মান কর আপকা পাণি, অ্যাকসেপ্ট কিয়া।'

— 'হয়নি হয়নি। ধ্যাৎ! অ্যাকসেপ্ট নয়— গ্রহণ কিয়া বলবে তো?'

— 'ওতে কোনো দোষ হয়নি। বিয়ের মন্ত্র যে ভাষাতেই হোক শুদ্ধ উচ্চারণে বললেই হয়। আমাদের কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল।'

— 'মোটেই না। ঢাক-ঢোল, সানাই-শাঁখ, বেনারসী-চন্দন ছাড়া বিয়ে হয় নাকি?'

হয়। হয়েছিল তাই। মামাশ্বশুর রুস্তমজী ওর তরফে অভিভাবক ছিলেন। স্পেশিয়াল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে হয়েছিল। ঘটা করে বিয়ে না হয়েও ও সুখী হয়েছে। রিসিপশনে সাইরাসের পরিবার যে ঘটা করেছিল সেই ঘটাপটার চমক কিছু কম ছিল না। সুখ মানুষের মনের ভেতরে থাকে, বাইরে খুঁজলে পাওয়া যায় না। সাইরাসের মতো স্বামী পেয়েছিল বলেই বাবা-মা'র অভাব ওকে বেশিদিন যাতনা দিতে পারেনি। টাওয়ার অফ সাইলেন্স-এর নীচে সিঁড়িতে বসে সাইরাস বলেছিল ওদের কথা অর্থাৎ পার্শীদের কথা।

হিন্দুধর্মের মতো জোরোআসট্রিয়ান ধর্মও প্রাচীন ধর্ম। হজরত মহম্মদ, যিশুখৃষ্ট এঁদের আবির্ভাবের বহু আগে থেকে ইরানে জোরোআসট্রিয়ান ধর্ম প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত। ইরানের প্রাচীন সম্রাটরা প্রত্যেকে এই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বলে জোরোআসট্রিয়ানিজম রাজধর্ম অর্থাৎ 'স্টেটরিলিজন' রূপে স্বীকৃত ছিল সিক্সথ সেঞ্চুরি বি সি থেকে। ইরান তখন মুসলিম কান্ট্রি ছিল না। ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়নি তখনও ইরানিরাও মন্দির বানাতো। নানা দেবদেবীর, প্রকৃতির পুজো করত। প্রফেট জোরোআসটার বলেন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁকে নানা রূপে পুজো করা বাতুলতা মাত্র। জীব জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এক, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান, তাই 'গড অফ উইজডম' নামে এক সিঙ্গল মূর্তি তৈরি করে পুজো কর। আর যেহেতু মাটি, জল আর আগুন বেঁচে থাকার জন্য প্রধান তিনটি উপাদান সেই হেতু প্রকৃতির এই তিনটি উপাদানকে অপরিহার্য মনে রেখে সর্বদা শ্রদ্ধা করবে।— প্রফেট জোরোআসটারের ব্যাখ্যা সম্রাটদের এবং সাধারণ মানুষদের কাছে সহজ-সরল গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সিঙ্গল গড উইজডমের মূর্তি মন্দিরে মন্দিরে স্থাপন করা হলো আর নিউ থট অফ ওয়ারশিপিং-এর প্রবর্তক জোরোআসটারের নামে ধর্মের নাম জোরোআসট্রিয়ানিজম হলো। সত্য, পবিত্রতা আর শান্তি— এই তিনটি ভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা, মেনে চলা হলো দীক্ষামন্ত্র। ঈশ্বরের একমাত্র রূপ গড অফ উইজডম মূর্তিকে প্রফেট নাম দিলেন 'আহুরা মাজদা'। তিনি বললেন, ঈশ্বর সৃষ্টিকে যা কিছু উপাদান দিয়ে সাজিয়েছেন সেইসব কিছুই জীবজগতের কারো না কারো কাজে লাগে, তাই কোনো কিছু নষ্ট বা অপচয় করো না। মৃত পশুর শব অন্য প্রাণীর খাদ্য হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর শবদেহটি অসাড় পিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা তোমাদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে অথবা মাটিতে পুঁতে দিয়ে নষ্ট করো না, একটি মৃতদেহ কিছু মাংসভোজী পাখির কয়েকদিনের জীবনধারণের উপাদান হতে পারে, তাই পরম শ্রদ্ধা সহকারে 'ভেনেরেট' করো। অর্থাৎ কোলাহল থেকে দূরে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সুন্দর নিঃশব্দ শান্তিপূর্ণ উন্মুক্ত স্থানে প্রিয়জনের শব শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে যত্ন করে শুইয়ে রেখে আসবে। যাতে শেয়াল কুকুর খাটাশ নয়, পাখিরা এসে নির্বিঘ্নে গ্রহণ করতে পারে। এই স্থানটিকে সবচেয়ে পবিত্র স্থান বলে মান্য করো। — অঙ্গনা তুমি দেখেছ নিশ্চয় পাথরে বাঁধানো বিরাট গহ্বরটির চারপাশ

ঘিরে মসৃণ পাথরের দেওয়াল গোল করে ঘিরে রেখেছে। ওখানে শুধু পাখিরাই নামতে পারে, শেয়াল-কুকুর নয়। আমি মরে গেলে পাখিদের আহার হবে এই প্রাণহীন শরীর। এই আমার ধর্ম মানে রিলিজিয়াস ফেথ।'

ওর শরীর শিরশির করে উঠেছিল, কাঁটা দিয়েছিল গায়ে। ওরা বেদীর নীচে সিঁড়িতে যেভাবে বসেছিল, সেভাবেই আছে এখনও। সাইরাস তখনও ওর হাতটা ধরে রেখেছিল। চারপাশের নিঃস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ওর বলা কথাগুলোই একমাত্র শব্দ ছিল। সাইরাস উঠে দাঁড়িয়ে ওকে শুদ্ধু টেনে তুলে বলেছিল— 'এখানে বসে ধর্মালোচনা করলাম এবার কোর্টহাউস গ্রাউন্ডে গিয়ে বলব ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের ইতিহাস, চলো।'— গাড়ি স্টার্ট করে নির্বাক ওকে লক্ষ্য করে বলেছিল— 'ভয় পেয়েছ জানি। প্রিয়জনের দেহ পাখিরা খুঁটে খাবে, একথাটা ভেবেই ভয় পায় সবাই, ভাবে না আগুনে দিলে পোড়ার কষ্ট মাটিতে পুঁতে দিলেও দমবন্ধ হবার কষ্ট। আরে, মারা যাবার পর কেউ আর কোনো কষ্ট পায় না রে বাবা! কষ্ট বেঁচে থাকলেই বোঝা যায়, মৃত্যু মানে সব কষ্টের অবসান। বুঝলে?'

— 'আচ্ছা, ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ড না হয় বুঝলাম কিন্তু এখানে কি কখনও কোনো কোর্ট ছিল? আর্কিটেক্ট দেখলে মনে হয় মুসলিম। বিরাট হল, চারদিকে ঘিরে আছে আর্চ করা এত এত খোলা দরজা, যেগুলো ছাদ অব্দি উঁচু। বিশেষ করে ছাদের মাঝখানের গোল গম্বুজটা একেবারে মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন'। — জিজ্ঞেস করেছিল ও।

— 'হতে পারে। ইসলামের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইরানে মুসলমানরা পার্শীদের মূর্তি পুজোকে কেন্দ্র করে খুনোখুনি শুরু করেছিল। হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো নাহয় মরো। ক্রুসেডের পর ক্রুসেডের নামে বর্বরতা চালিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে। পার্শী ফায়ার টেম্পলগুলো ধ্বংস করেছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হয়নি তাদের মুণ্ডুচ্ছেদ করে হত্যা করেছে। ভয়ে আতঙ্কে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় পার্শী বাধ্য হয়েছে ইসলাম ধর্ম নিতে। হাজার হাজার পার্শী ইরান ছেড়ে পালিয়ে গেছে অন্যান্য দেশে। সিক্স সেঞ্চুরি বি. সি. থেকে এখন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি এ. সি.-র শেষপ্রান্তে এসেও ওরা আর সিভিলাইজড হলো না। যেমন ধর্মান্ধ বর্বর ছিল তেমনই থেকে গেল। বরং ওদের পশুসুলভ হিংস্রতার লক্ষণ দিনে দিনে আরও বাড়ছে। ওরা এখন গ্লোবাল ইসলামাইজেশন চায়। সুসভ্য পৃথিবীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত— অন্ধকার গুহায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে আমরা হয়তো মুসলমানদের চরম নারকীয়তার সাক্ষী হব নয়তো ওই বর্বরদের হাতে মরব। পৃথিবীর প্রধান যে রিলিজিয়নগুলো আছে, সেগুলো প্রত্যেকটির মূল মন্ত্র হলো অহিংসা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদি— সকলেরই প্রিচিং ছিল শান্তি। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সত্যের পথে চলা, মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা বজায় রাখা, সর্বাবস্থাতে হিংসা পরিহার করা। কিন্তু এই একটিমাত্র ধর্মের প্রিচিং-ই হলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো নাম নেই, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম কোনো বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যারা ইসলামে বিশ্বাস করবে না, তারা কাফের। কাফেরদের হত্যা করো, তাহলেই আল্লাহ খুশি হবেন। স্বর্গে যেতে পারবে।

সেই নারকীয় দুঃসময়ে ইরানিরা যখন হোমল্যান্ড ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয়ের খোঁজে পালাচ্ছিল নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে, তখন ডোরাবজী নানাভাই প্যাটেল নামে প্রথম ইরানি পার্শী পুরুষ এসে নেমেছিলেন মহারাষ্ট্রের কোস্টে। তাঁর পেছন পেছন হাজার হাজার পার্শী পুরুষ এসে পড়েছিল গুজরাট সমুদ্র উপকূলে। সেটা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ। মহারাষ্ট্রের মালাবার আর গুজরাটের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৬৪০ সালে ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথম আগমন। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ তাঁদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি হয়ে উঠেছিল। বহু পুরুষ পর এখন আর দ্বিতীয় নয়, ভারতই ভারতীয় পার্শীদের মাতৃভূমি। এদেশে নিজের মতো করে বাঁচার, নিজের ধর্মবিশ্বাস পালন করার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা। এক বড় সংখ্যার ইরানি দল পালিয়েছিলেন ইজরায়েলে। তাঁরা ইহুদি হয়ে সেখানেই সেটল্ করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ অর্থশালী পরিশ্রমী পার্শী সম্প্রদায় ভারতবর্ষে এসে পরিশ্রম করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন করে। মিশে গেছেন এদেশের মূল ধারার সঙ্গে। আধুনিক ভারতের অর্থনীতিতে পার্শী সম্প্রদায়ের শিল্প উদ্যোগের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডের ইতিহাস ১৮৩০ সালের। এই জায়গা জমি শুনেছি কোনো মুসলমান নবাবের সম্পত্তি ছিল, যা ইংরেজরা কিনেছিল কিংবা দখল করেছিল। ১৮৩০ সালে নওরঙ্গজী সোরবজী নামে একজন এখানে কলোনি বানাবার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে পারমানেন্টলি কন্ডিশনাল এক এগ্রিমেন্ট করে সেই সময়ের তুলনায়

With Best Compliments from-

A Well Wisher

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

অনেক বেশি দাম দিয়ে এই জায়গা কিনে মালাবার থেকে যারা এখানে শিফ্ট করতে চায় তাদের কাছে জমি বিক্রি করেছিলেন। এবারও শর্ত সাপেক্ষে। ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ড নাম বদলানো যাবে না, কেন্দ্রস্থলে কোর্ট হাউস বা 'দরবার' যাই বল সেটা ভাঙা যাবে না। কোনো বাড়ি দোতলা করা যাবে না, একমাত্র পার্শী ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ি হস্তান্তর করা যাবে না ইত্যাদি। এখানে টোটাল একষট্টিটা বাড়ি আছে। আমাদের নিজেদের ইলেকটেড সোসাইটি এই কলোনির দেখভাল করে। একমাত্র বিজলি, পানি, রোড, স্যোয়ারেজ ছাড়া আমরা কর্পোরেশনের কাছ থেকে আর কোনো সহায়তা নিই না, জানো? টাইট সিকিউরিটি, সাফসাফাই, আরও অনেক কিছুই সোসাইটি মেইনটেন করে। মোদ্দা কথা হলো, প্রাইভেসি আর স্যাংটিটি রক্ষা করার জন্য নিজের হাতে রাখা। তবে ওল্ডকোর্ট বিল্ডিং দেখতে যেমনই হোক ওটা আমাদের কমিউনিট হল, অডিটোরিয়াম, বিয়ের হল, পার্শীদের ধর্মীয় সৎসঙ্গের সিনাগগ, মহিলাদের বাৎসরিক সেলাই ফোঁড়াইয়ের এক্সিবিশন হল— মানে পারমানেন্ট মাল্টিপারপাস ইউজএবল দরবার কক্ষ। —এই হলো ইতিহাস। আজ এখানেই শেষ। বাকি যা রইল তুমি যখন নিজে এখানে থাকতে আসবে তখন জেনে নিও।

অনেক আগে শেষ হয়ে যাওয়া খালি কফি-পেয়ালা হাতে নিয়ে বসে রইল দেবাঙ্গনা। শিরিণ ওর আর সাইরাসের ভালবাসা থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান। একজন নাবিক অন্যজন অভিনেত্রী। দুজনেরই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু ওদের চরিত্রে কাদা ছেটানোর ক্ষমতা কারো নেই। আর শিরিণ কিনা আঠারো বছর বয়সেই পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল? সেই প্রথম যেদিন ও জুহু বিচে গিয়েছিল মনীষাদের সঙ্গে, সেই রাতেই দেবাঙ্গনা ওর পরিচিত প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে দুবেলা দুজন বডিগার্ডের ব্যবস্থা করেছিল মেয়েকে আড়াল থেকে সারাক্ষণ নজরে রাখার জন্য। ওর নিজের বডিগার্ডরা এই এজেন্সি থেকেই এসেছিল। এখন ওর আর দেহরক্ষী লাগে না। কিন্তু মেয়ে গাড়িতে করে যেতে চায় না, ও কমন পিপ্‌লদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে, কমন মানুষের মতো চলাফেরা করার স্বাধীনতা চায়। দেবাঙ্গনার ভালই লেগেছিল, কিন্তু শিরিণ নিজেকে কমন ভাবলেও কমন তো নয়। তার ওপর এক ডালা গোলাপের মতো রূপ। বদ লোকের নজর পড়া খুবই স্বাভাবিক। তাই শিরিণ বাড়ির বাইরে বের হলেই মেন গেট থেকে গোপালন নয়তো কার্জন বাইকে ওর ট্যাক্সি, অটো, বাস— যাতেই চাপুক সেটা ফলো করত। ওরা দুজনেই ট্রেইন্ড। ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট, ফাস্টশ্যুটার। শিরিণ জানতেই পারেনি যে যতক্ষণ ও বোম্বের পথে পথে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরে ততক্ষণ পালা করে কার্জন-গোপালনদের চোখে ওর গতিবিধি ওর সঙ্গীসাথী সবকিছু নজরবন্দি হয়ে থাকে। ও মেন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবাঙ্গনা রিপোর্ট পেয়ে যায়— 'ম্যাডাম শি'জ হোম।' — কাল রাতের আগে গত দু'বছরে রিপোর্টকার্ডে লালকালির দাগ পড়েনি। কী করে সাইরাসকে বলবে? কী জবাবদিহি দেবে ভেবে পায় না দেবাঙ্গনা।

আনন্দ, কার্জন আর গোপালন এসেছে। শিরিণ ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বেশ ভাল করেই ব্রেকফাস্টও করেছে। মনে হচ্ছিল কাল রাতে খাওয়া হয়নি। সবই করেছে কিন্তু নীরবে। উঁ-হ্যাঁ ছাড়া আর কিছু নয়। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন শক্তি সংগ্রহ করছে ভেতরে ভেতরে। সবাই হলঘরে বসেছিল। আনন্দ কথা শুরু করল— 'শিরিণ বেটা কাল কে তোমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল?'

সবাইকে চমকে দিয়ে শিরিণ বলল— 'কেউ নিয়ে যায়নি, আমি নিজেই গিয়েছি।'

— 'নিজেই গেছ? সত্যি বলছ? তোমার সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব ছিল না?'

— 'বন্ধুরা হলে আগেই পৌঁছে ছিল আমি পরে গেছি চাচু।'

— 'এবারই প্রথম গেলে নাকি আগেও গেছ?'

— 'আগেও গেছি কয়েকবার, কিন্তু পুলিশ রেড হয়নি আগে।'

— 'রেভ পার্টিতে প্রথমবার কে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল বলবে?'

— 'না, চাচু বলব না। অন্যকে কেন ফাঁসাবো? আমার ভালো না লাগলে দ্বিতীয়বার যেতাম না। আমার ভালো লাগে তাই যাই।'

— 'ওসব পার্টিতে ড্রাগ খাওয়া হয় জেনেও যেতে? ড্রাগ কনট্রাব্যান্ড। পজেশনে রাখা, ব্যবহার করা, বিক্রি করা সবই পানিসেবল অফেন্স, জানো না?'

— 'জানি। আমি একজন অ্যাডাল্ট, চাচু। আমার জীবন কীভাবে কাটাবো সেটা আমি বুঝব। আমি ড্রাগ নিই না, কিন্তু যারা নেয় তাদের দোষও দিই না। বেশিরভাগই হতাশা

ভুলে থাকার জন্য ড্রাগ, ড্রিঙ্কসের সাহায্য নেয়, কেউ কেউ অবশ্য শখ করেও নেয়। তোমরা সমাজের এত ওপরে থাকো, সেখান থেকে নীচের দিকটা দেখা যায় না, তাই ওখানে কী হয় জানতেও পারো না।'

— 'রেভ পার্টিতে সমাজের নীচের তলার ছেলেমেয়েরা যেতে পারে না শিরিণ। তোমার মতো উঁচু তলার কমবয়সীরাই যায়। মম-ড্যাডের মান-সম্মানের কথাও ভাববে না তুমি? নেহাৎ পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে কাল, নাহলে কোর্ট-কাছারি হতো, বোম্বে সিটির প্রথম সারির মানী মানুষ তোমার মম-এর বদনাম, পরিবারের বদনাম নিয়ে ভাববে না তুমি? নিজেকে তো অ্যাডাল্ট বললে, ভাবার বয়স তো হয়েছে।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে শিরিণ বলল— 'ড্যাডকে টেনো না। আমাদের লাইভলীহুডের জন্য ড্যাডকে চাকরি করতে হয়, দূরে থাকতে হয়। আর পরিবার? অ্যানি ম্যাডাম ছাড়া আমার জীবনে আর কী ছিল চাচু? এই বাড়িতে পরিবার ছিল না। একটা বাচ্চা আর একজন গভর্নেস নিয়ে পরিবার হয় না। মমের সুনাম বদনাম নিয়ে আমার মাথ্যব্যাথা নেই। মমকে যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, যখন মমের জন্য লুকিয়ে কাঁদতাম একটু কাছে থাকার জন্য তখন মম কি আমার কথা ভেবেছে? ড্যাড পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে, মম নিজের ভাললাগা সিনেমা জগতে আরও যশ, আরও টাকার নেশায় বুঁদ হয়ে থেকেছে। আমার জন্য ভাববার সময় ছিল না মমের। পরিবার বলতে যদি কেউ থাকে আমার তবে তিনি শুধু অ্যানি ম্যাডাম। আমার মা, দিদিমা, ঠাকুমা— সব শুধু উনি। এবার আমি উঠব চাচু, আমাকে বেরোতে হবে।'

গোপালন বলল— 'এক মিনিট মিস শিরিণ।' একটা এনভেলাপ থেকে কতগুলো ফটো বের করে টেবিলে রেখে বলল— একবার এগুলো দেখে শুধু বলে যান এদের মধ্যে কেউ আপনাকে কখনও বিরক্ত করেছে কিনা?'

একঝলক তাকিয়েই ও বলল— 'ওরা আমার সঙ্গে আছে বলেই তো আপনারা দুজন ছবিগুলো তুলেছেন, তাই না? ওরা সবাই আমার বন্ধু, বিরক্ত করে না, ওরা আমার শুভার্থী। আজ থেকে আপনারা আমাকে ফলো করবেন না আর। ওরাই আমার বডিগার্ড। মম, অযথা আপনাদের মাইনে দিচ্ছে।'

ঘরের সবাইকে বোবা করে পিনড্রপ সাইলেন্স ক্রিয়েট করে শিরিণ উঠে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা কাটিয়ে দেবাঙ্গনা প্রথমে কথা বলেছিল— 'এ কোন শিরিণকে দেখলাম আনন্দভাই?'

আনন্দ বলেছিল— 'পুরোপুরি পরিণত এক নারীকে দেখলে ভাবিজান, আঠারো বছরের মেয়েকে নয় অন্তত।'

কার্জন বলল— 'দু-বছর ধরে আমরা যে ওকে ফলো করি এটা শিরিণের বোঝার কথা নয় স্যার। রোমির নেটওয়ার্ক বুঝেছিল, ওরা রোমিকে জানিয়েছে, রোমি শিরিণকে বলেছে। কাল রাত্রে অ্যারেস্টেড চারজন উদ্যোক্তার মধ্যে রোমি একজন। শিরিণ মিথ্যে বলেনি। কাল আমি ওকে ফলো করেছিলাম। শিরিণ একা গিয়ে নেমেছিল।'

দেবাঙ্গনা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করছে— 'রোমি কে?'

— 'রোমি হলো বোম্বে আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক ছোট মছলীর ছেলে। বাপ বড় মছলী হতে পারেনি, কিন্তু রোমি হবে একদিন। এই রোমির সঙ্গে শিরিণের ভাল ফ্রেন্ডশিপ আছে। রোমি ধীর-স্থির মুখোশ পরা পেশেন্ট ভালচার। যা চায় সেটা না পাওয়া অব্দি হাল ছাড়ে না। কিন্তু মূর্খের মতো ঝপ করে থাবা বসায় না। প্রকৃত সময় সুযোগ আসার জন্য অপেক্ষা করতে জানে। নেটওয়ার্ক খুব সচল। কাল রাতে অ্যারেস্ট হয়েছে বটে, তবে আজ এতক্ষণে বেইলে ছাড়াও পেয়ে গেছে হলফ করে বলতে পারি। শিরিণ রোমির বাইরের ভালমানুষী দেখে বন্ধুত্ব করেছে, ভেতরের নোংরা চেহারাটা দেখার সুযোগ হয়নি। সেটাই আমাকে ভাবনায় ফেলেছে। মুশকিল হলো শিরিণকে এসব বলে অ্যালার্ট করাও যাবে না। ও আমাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না।'

কার্জন-গোপালনরা চলে যাবার পর ওরা দেওর-বৌদি নিজেদের মতো করে কথা বলার অবকাশ পেয়েছিল।— 'তোমার ভাইজানকে কী করে জানাব বল তো? দশদিন আগে ও গাল্ফে ছিল দুবাইয়ের জেবেল-আলি শিপ ইয়ার্ডে। বলেছিল, সেখান থেকে সাউথ আফ্রিকার পোর্ট অফ কেপটাউনে যাচ্ছে। এখন তার মানে ইন্ডিয়ান ওশেন-এ আছে ওর জাহাজ...'

— 'ভাইজানকে কি না জানালেই নয়? মারাত্মক কিছু ঘটেনি, একটা তুচ্ছ ব্যাপার যা এখন এই সিটি, সেই সিটিতে রোজ হচ্ছে। তুমি এগুলোকে নিয়ে বেশি ভেবো না। জমানা বদলে গেছে, এই জমানাতে ছোট ছেলেমেয়েরা বয়স্কদের মতো বিহেভ করছে। আমাদের ওদের নিয়েই তো চলতে হবে ভাবীজান। আমরা নিরুপায়।'

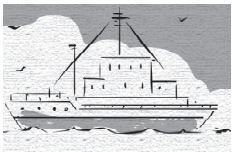

— ‘আমাকে একটা থাকার জায়গা খুঁজে দিতে হবে রোমি।’

— ‘কেন?’ — বিস্মিত চোখে চেয়ে প্রশ্ন করেছে রোমিও জিলানী।

— ‘ওল্ডকোর্ট ইয়ার্ডে থাকতে ইচ্ছে করছে না, তাই।’

— ‘সে কী কথা? যে জায়গার প্রতি মানুষের এত কৌতূহল কিন্তু দেখতে পায় না, কয়েকশো বছরে বড়জোর কয়েকশো ভেরি স্পেশিয়াল মানুষ ভেতরে যেতে পেরেছে সেই জায়গার মেয়ে বলছে, ঘিঞ্জি মুম্বাই শহরে ঘর দেখে দাও? কী ব্যাপার বল তো? ফ্যামিলি ফিউড?’

— ‘বাজে কথা রাখো। রুম শেয়ারিং করতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘর চাই।

এই মেয়ে সস্তা মেয়ে নয়। ওকে বলা যায় না— ‘তবে আমার সঙ্গে রুম শেয়ার কর।’ ধীরে ধীরে লাটাইয়ের সুতো গোটাতে হবে তা না নাহলে পতং ভো-কাট্টা হয়ে যাবে। পারস্য উপসাগরের মুক্তো, পার্শী গোলাপ। জোর করে ধরতে গেলে পাপড়ি খসে পড়বে, মসৃণ খাঁটি বহুমূল্যবান মুক্তো হাত থেকে পিছনে পড়ে হারিয়ে যাবে। আড়াই বছর ধরে পাহারা দিয়ে রেখেছি বোম্বের মতো সিটিতে যাতে কোনো শুয়রের বাচ্চা হাত না লাগায়। ও শুধু আমার হবে। ওর শরীরের দৌলত, ওর বাপ-মার জমানো অরব-খরব দৌলত, ওদের সোশিয়েল স্ট্যাটাসের দৌলত— সব একদিন আমার হাতের মুঠোয় আনতে হবে।

অত্যন্ত কোমল গলায় রোমি বলল— ‘বুঝতে পারছি রেভ পার্টির জের এখনও চলছে তোমার বাড়িতে। সরি শিরিণ, আমার দোষে তোমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। প্রমিস করছি, আর কখনো তোমাকে এমন বিপদে ফেলব না। কিন্তু বকুনি খেয়েছ বলে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে একথা ভাবাও অন্যায়।

তোমার মম কী দোষ করেছেন বল? দোষ আমার। আমি একটা ফালতু রাস্তার ছেলে, একটুখানি আনন্দ পাবার জন্য যা-তা করতে বাধে না আমাদের। পুলিশ কতবার ধরেছে, মান থাকলে তো মান যাবার ভয় থাকবে! কিন্তু তুমি তো মানী পরিবারের মেয়ে। আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করাটাও তোমাকে মানায় না, তবু তুমি মেশো, সে না হয় ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে বাজে জায়গায় নিয়ে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। বাড়ি ছাড়ার কথা ভুলে যাও প্লিজ! রুম শেয়ার করে তুমি থাকবে? সব কিছু সকলের জন্য নয় শিরিণ। তুমি যে পরিবেশে থাকো, সেখান থেকে একটা ছোট্ট বদ্ধ ঘরে চারদিকে অগোছালো ছড়ানো জিনিসপত্র দুপাশে দুটো চারপাই, মাঝখানে একটা পাখা, হাওয়া পাবে না, তেমনি বাথরুম— কী করে থাকবে তুমি? এছাড়া নিজেকে রান্না করতে হবে, নাহলে ডিব্বওয়ালার খাবার খেতে হবে। ঘর পরিষ্কার, বর্তন মাজা, কাপড় কাচা— সব করতে হবে। শোনো, এসব অসম্ভব কল্পনা মাথায় এনো না। অভিমান হয়েছে বলে এত নীচে নেমে আসা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বোকামির নামান্তর।'

শিরিণ মেনে নিয়ে বলল— 'এতসব জানতান না রোমি। এত কষ্ট করে থেকে চাকরি করা বা পড়াশুনা করা কী করে সম্ভব হয়? আমি কোনো কাজই তো করতে জানি না। তুমি খুব ভাল বন্ধু, তাই প্র্যাকটিক্যাল দিকটা দেখিয়ে দিলে। থ্যাঙ্ক ইউ।'

— 'আর একটা প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান দেব। তুমি আয়নায় নিজেকে দেখ নিশ্চয়। শোনো, এই রূপ নিয়ে বোম্বের পথেঘাটে প্রোটেকশন ছাড়া যেনতেন ভাবে ঘুরে বেড়ালে তুমি বেশিদিন টিকবে না। লোপাট করে দেবে তোমাকে।'

— 'অনেকদিন ধরে তো এভাবেই ঘুরছি, কই লোপাট হয়ে যাইনি তো? এটা বাজে কথা বললে।'

— 'বাজে কথা নয়। লোপাট হওনি, কারণ তুমি সবসময় আন্ডার সারভেলেন্স ছিলে। তোমার বডিগার্ডরা বাইকে করে তোমার ঠিক পেছনেই থাকত। তারপর তুমি আমাদের দলের মাঝে চলে আসতে। আমরাও কিন্তু তোমাকে প্রোটেক্ট করি। আমাদের মতো রাস্তার ছেলের দঙ্গলকে সহজে কেউ ঘাঁটায় না। মারপিট করতে আমরা ওস্তাদ। মান সম্মানও নেই, পুলিশের পিটুনির পরোয়াও নেই। এই দেখ, পুলিশের লাঠি মাথা ফাটিয়েছিল। তিনটে স্টীচ পড়েছে।'— রোমি চুল সরিয়ে দেখায়। — 'দীপক, সিভাস, বেঞ্জামিন, মনীষা, প্রশান্ত ওরা হলো তোমার লেখাপড়া করা ভাল বন্ধু। আর আমি, পারশ, মনোহর, হরিশ, আজমল, নৌসাদ— মানে আমাদের দলটা হলো স্কুল ড্রপআউট বাজে বন্ধু। একটা জায়গায় আমরা সবাই একাকার, সেটা হলো আমরা সবাই একেবারে নগণ্য ঘরের ছেলেমেয়ে। আমরা সবাই তোমাকে বড় ভালবাসি শিরিণ।'

অভিভূত শিরিণ বলল— 'জানি রোমি। আমিও তোমাদের সবাইকে মানে ভাল-মন্দ নির্বিচারে সবাইকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি। ছোটবেলা থেকেই আমাদের হাই সোসাইটি কখনো আমাকে আকর্ষণ করত না। মেডসার্ভেন্টদের ছেলেমেয়েরা বন্ধু ছিল। ওদের সঙ্গে ডান্ডাগুলি খেলতাম। কত সহজ-সরল ওরা। ঠিক যেমন আজ তুমি নিঃসংকোচে বললে, স্কুল ড্রপআউট, বাজে ছেলে, রাস্তার ছেলে ইত্যাদি বিশেষণগুলো দিতে মুখে আটকালো না তোমার। ওরাও ছোট থেকেই এরকম ছিল। অত্যধিক বিত্তবানরা এত সিধাসাধা হয় না।'

— 'কেন হবে না? হয়। তুমিই তো প্রমাণ।'

— 'আমি একজন, সবাই নয়। সবাই হলে আমি তো তোমাদের পেতাম না। বিশেষ করে তুমি। দুনিয়ায় সবাই যখন নিজের দোষ ঢাকতে ব্যস্ত, তুমি তোমার দোষ বলতে ব্যস্ত। আমার আশ্চর্য লাগে, এমনও হয়?'

— 'থ্যাঙ্ক ইউ শিরিণ, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। আজ আমি তোমাকে এসকর্ট করে পৌঁছে দেব।'

অ্যানির মনে হয় মা-মেয়ে কাছাকাছি হবার চেষ্টা করেও গড নোজ কী কারণে হতে পারল না। কয়েকটা বছর ভাল কাটিয়ে শিরিণ আবার আগের মতো কেন হলো বুঝতে পারেন না অ্যানি। মিসেস জাভেরির এবার কোনো দোষ নেই, দোষ শিরিণের। মেয়েটা যে কী চায় নিজেই বোঝে না বলে মনে হয় অ্যানির। দ্যা মোস্ট, আন স্টেবল চাইল্ড আই হ্যাভ এবার সিন! শি ডাজ নট নো হোয়াট মিসটেক শি ইজ ডুইং, হাউ শি ইজ রুইনিং হার ওন লাইফ! জিসাস সেভ দ্যা গার্ল! ওকে আর পাল্টানো যাবে না, কুড়ি বছর বয়স নিজে থেকে নিজের ভুল বুঝে স্বভাব না বদলালে কারও সাধ্য নেই ওকে বদলায়। স্যার সাইরাস এসেছিলেন, ওকে দেখে কত যে বিষণ্ণ হয়ে ছুটি কাটিয়ে চলে গেলেন সে চোখে দেখা যায় না। শিরিণ মাকে তো মানেই না, এবার স্যারকেও অ্যাভয়েড করেছে। এদের দুজনের দিকে তাকাতে কষ্ট হয় অ্যানির। স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে শিরিণ। কখন যে কী অঘটন ঘটিয়ে

বসবে, সেই ভয়ে স্বামী-স্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। এ তোমার কী বিচার গড! নিষ্পাপ দুটো মানুষকে কেন কষ্ট দিচ্ছ কিসের পরীক্ষা নিচ্ছ? শিরিণ ইল ম্যানার্ড, অ্যারোগেন্ট, স্টাবার্ন, সেলফিশ শুধু নয়, ওর মাত্রাহীন স্বেচ্ছাচারিতা স্টুপিডিটির পরিচয়। অনেকদিন আগে মিসেস জাভেরি বলেছিলেন— ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। ইমোশোনাল ব্ল্যাকমেল। সেদিন অ্যানি প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু এখন দেখছেন মিসেস জাভেরি ঠিক ধরেছিলেন। ওর প্রতি বাবা-মার মমতার সুযোগ নিচ্ছে শিরিণ। তাও যদি কমন পিপ্‌লের সঙ্গে মিশে তাদের জন্য কিছু কাজ করত, তাহলে তবু কথা ছিল। কিন্তু ওকে তো ওদের জন্য উপকার করতে দেখা গেল না। শুধু সারাদিন ওদের সঙ্গে কাটানো আর রাত করে ফেরা ছাড়া আর কিছুই অবদান নেই। মার সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু মার সেক্রেটারির কাছ থেকে মাসিক খরচের অ্যালাউন্সের চেক নিতে ভোলে না। অ্যানির আবার অরফ্যানেজ-এ ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু মিসেস জাভেরির প্রতি, এই বাড়ির প্রতি দায়বদ্ধতা কেমন করে অস্বীকার করবেন? আজ অবধি নিজের জন্য টাকা খরচ করার দরকার পড়েনি। পরনের শাড়িগুলোও মিসেস জাভেরি পছন্দ করে কিনে নিয়ে চলে আসতেন। এত বছর ধরে স্যালারির টাকা ব্যাঙ্কে জমে জমে তিনিও এখন ধনী মহিলা হয়ে গেছেন। ড্রাইভার প্রমোদের ছেলেটা ভাল ছাত্র ছিল। স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবে। এই স্বপ্নপূরণ প্রমোদের সামর্থ্যের বাইরে, তাই ও প্রদীপকে সাধারণ কলেজে ভর্তি করতে গিয়েছিল। মিসেস জাভেরি জানতে পেরে প্রদীপকে ক্যাপিটেশন ফিজ দিয়ে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করলেন, পড়ালেন। প্রদীপ ব্যাঙ্গালোরে ভালো চাকরি করে। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছে। মা-বাবাকে নিয়ে যেতে চায়। প্রমোদ বলেছে, মেমসাহেবকে একা ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারব না। অ্যানিও যেতে পারবেন না। একই বাড়িতে থেকে ড্রাইভারের ছেলে যাঁর দয়ায় মানুষ হলো সেই মহীয়সী মহিলার মেয়ে অমানুষ হয়ে এবাড়ির পবিত্র পরিবেশকে বিষাক্ত করে রেখে দিয়েছে— একথা ভাবলে অ্যানির বুক ফেটে যায়। আবার এই মেয়েই সকলের সামনে বলে বলেছে— 'অ্যানি ম্যাডাম ছাড়া আমার কোনো পরিবার নেই। উনি আমার মা, দিদিমা, ঠাকুমা সবকিছু।' কোন প্রাণে চলে যাবেন এদের ফেলে?

রোমিও জিলানির বিজনেস ভালো দাঁড়িয়ে গেছে। বাবা আসরফ জিলানী যা করতে পারেনি রোমিও জিলানি অল্প বয়সেই লক্ষ্যস্থির রেখে একক প্রচেষ্টায় আন্ডারওয়ার্ল্ডে বেশ ভাল জায়গা করে নিয়েছে। স্ক্র্যাপ, রিয়েল এস্টেট, ঠিকাদারির আড়ালে আর্মস আর ড্রাগ সাপ্লাই রমরম করে চলেছে ওর। নিজের অতি সাধারণ 'রাস্তার ছেলে' ইমেজটাকে পাল্টায়নি বুদ্ধি করে। পাল্টালেই হঠাৎ বড়লোক হওয়া রোমির ওপর সকলের নজর পড়ত। বেনামিতে অনেক সম্পত্তির মালিক রোমিও জিলানী। ও নিজে এই ধরনের অ্যাচিভমেন্টকে বড় পাওনা বলে মনে করে না। এগুলো হতোই। ওর বড় পাওনা হলো শিরিণ জাভেরি। ওর জীবনের অবসেশন শিরিণ জাভেরি এখন রোমির প্রেমে অন্ধ হয়ে আছে। শিরিণের জীবনে রোমি প্রথম প্রেম, প্রথম পুরুষ— এই চরম সত্য রোমির সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাচিভমেন্ট। আসরফ জিলানি মাহিমের বস্তির খোলিতে থাকত, সেই খোলিতে রোমির জন্ম। প্যান্ট খুলে চলমান যানবাহন দেখতে দেখতে রাস্তার কিনারায় বসে প্রাতঃকৃত্য করেছে রোমি। বাপ ছিঁচকে চুরি, পকেটমারি করে করে অপরাধ জগতে কোনোমতে ঢুকেছে বটে, তবে সেরকম নামযশ অর্থ কামাতে পারেনি এখনও। মাহিম বস্তির খোলি ছেড়ে মালাড অঞ্চলে ফ্ল্যাট কিনে রাস্তায় প্রাতঃকৃত্য করা বন্ধ হয়েছিল। রোমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তে যেত— এটুকু উন্নতি করেছিল রোমিওর আব্বু। ইংলিশ স্কুলে পড়াবে বলে ছেলের ইংরেজি নাম রেখেছিল, রোমির পরে আরও চারটে বাচ্চা পয়দা করেছে আম্মি।

শিরিণ বা ওর নিজের চ্যালাদের কাছে ব্যক্তিগত কোনো কথা ফাঁস করে না ও। শিরিণ জানে, রোমি ওর মতই সত্যি কথা বলতে ভয় পায় না, ওর মতই নিরহংকারী, নিজে যেমন ঠিক তেমন করেই প্রেজেন্ট করে নিজেকে, ভুল সিদ্ধান্ত নিতে গেলে রোমি সদুপদেশ দিয়ে ওকে আটকেছে, ওর টাকা-পয়সার জোর নেই, কিন্তু মনটা ভাল, দেখতেও ভাল। লম্বা-চওড়ায় মানানসই মাসকুলার বডি। মুখে বলে না, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা কখনো করে না, কিন্তু রোমি ওকে ভালবাসে— এই গুণগুলো কমই দেখা যায় ওর বয়সী ছেলেদের মধ্যে। রোমি ওর ইজ্জত ওর পরিবারের ইজ্জত নিয়েও চিন্তা করে। কার্জন আর গোপালনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বোম্বের মতো জায়গায় ওর মতো সুন্দর অভিজাত মেয়ের রাতবিরেতে একা একা চলা কত বিপজ্জনক হতে পারে

বুঝে নিজের চ্যালাদের নির্দেশ দিয়েছে, ওকে প্রোটেকশন দেবার জন্য। এমনকী নিজের বাইকে করে ওকে ছেড়ে এসেছে ওদের গেটে। হতে পারে রোমি উচ্চশিক্ষিত নয়, কিন্তু সহজাত ভাবে ওর মধ্যে যে শিক্ষা আছে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও সবার এইসব শিক্ষা থাকে না। শিরিণকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে এই সাধারণ ছেলে। ওর মনে রোমির আসন পাতা হয়ে গেছে। এবার সেকথা প্রকাশ করতে হবে।

— 'রোমি আমাকে কোনো নির্জন সৈকতে নিয়ে যাবে?'

— 'নির্জন সৈকতে? হঠাৎ নির্জন সৈকত কেন বলো তো?'

— 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে। যেখানে ভিড় নেই শুধু সমুদ্র-বালি আর নীরবতা সেখানে যাবো। চলো।'

— 'এক্ষুনি? পাগল নাকি? পরে একদিন নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।'

— 'পরে নয়, এখনই যাব। খুবই জরুরি দরকার।'

গিয়েছিল বোম্বে থেকে দূরে এক নিরিবিলি জায়গায়, যেখানে সৈকতে জেলেদের নৌকা, লম্বা দড়িতে সারি সারি ঝুলন্ত মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মানুষজন নেই। বালিতে মুখোমুখি বসে রোমিকে জিজ্ঞেস করেছিল— 'এরকম জনশূন্য বীচ সত্যিই আছে, আমার ধারণাই ছিল না। তুমি এত চেনো বোম্বেকে?'

— 'অলিগলি সব চিনি আমি। শাসন করার কেউ ছিল না, তাই ছোটবেলা থেকে ছাড়া গোরুর মতো ঘুরেছি। এবার বল কী জরুরি দরকারে এতদূরে এলাম আমরা?'

কিছুটা লজ্জা কিছুটা আবেগ মেশানো গলায় শিরিণ ওর হৃদয়ের কথা জানিয়েছিল। তখন দূরে সূর্যের লালটুকটুকে গোলক অস্ত যাবে বলে জলরাশির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। রোমি সব শুনে নীরব থেকে সেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ওর দিক থেকে সাড়া না পেয়ে শিরিণ নিজেই জিজ্ঞেস করেছে— 'তুমি কী ভাবছ রোমি? কিছু বললে না তো?'

রোমি মুখ না ঘুরিয়েই বলেছিল— 'যা অসম্ভব তা নিয়ে কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। তোমার আমার মধ্যে গাল্ফ অফ ডিসট্যান্স শিরিণ! নর্থপোল-সাউথপোল কখনো একটা বিন্দুতে মিলতে পারে না। আমি তোমার নখের যোগ্যও নই, তবুও তুমি আমাকে ভালবেসেছ, আশ্চর্য হচ্ছি আমি। রাজকন্যার পথের ভিখারিকে ভালবাসার রূপকথার গল্পের মতো মনে হচ্ছে শুনে।'

— 'কেন, রোমি? তুমি কি আমাকে ভালবাস না?'

— 'ভালবাসি শিরিণ, খুব ভালবাসি। ওই সূর্য অস্ত যাবে বলে জলের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে, এই দৃশ্যটা বড় ভালবাসি আমি, কিন্তু হাজার চাইলেও এই দৃশ্যকে ধরে রাখতে পারব না। একটু পরেই ও জলের তলায় ডুবে যাবে, একথা জেনেই দৃশ্যটাকে ভালবাসি। ঠিক তেমনি তুমি আমার জীবনে কখনোই চিরসঙ্গী হয়ে আসতে পারবে না, জেনেশুনেও তোমাকে ভালবাসি। তোমার পেরেন্টসদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে শুনলে। এমন অবাস্তব কথা ওঁদের কখনো বলতে যেও না।'

— 'ওদের আপত্তি কে শুনবে? মম-ড্যাডের বিয়েতে আমার নানা-নানির মত ছিল না। মম ওদের অমতে ড্যাডকে বিয়ে করেছে বলে ওরা একমাত্র মেয়েকে লিগ্যালি ত্যাগ করেছিলেন। আমার মম-ড্যাডও এটাই করবে জানি। তাতে কী? আমি তোমার সব কিছু জেনেশুনে তোমার চিরসঙ্গী হতে চাই, তুমি যেভাবে রাখতে পারবে সেভাবেই থাকতে চাই। আমি শুধু তোমাকে চাই রোমি, অর্থ-বিত্ত, বাড়ি-গাড়ি কিছুর কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। তোমার ভালবাসা আমার জন্য তোমার চিন্তা, আমার প্রতি নেওয়া তোমার কেয়ার— এটুকু পেলেই আমি খুশি। এবার এখান থেকে চলো। আজ পাঁচতলায় ছাদের ওপর তোমার ভাড়াটে অ্যাটিকটাও দেখে যাবো। ওখানেই থাকতে হবে তো।'

রোমিও জিলানির যতটুকু জানার ছিল জেনে নিয়েছে। রাজত্ব শুদ্ধ রাজকন্যা জুটবে না। তাহলে শুধু রাজকন্যাই আগে জুটুক, বিশেষ করে সে যখন নিজের ইচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে কাতর তখন এতদিনের প্রতীক্ষার সমাপ্তি হোক আজ। হাতের মুঠোয় এলে অন্য কত কাজে লাগবে এই মেয়ে। পাঁচতলা অব্দি লিফ্ট তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে রুফটপে রোমির লম্বাটে ঘরখানার চক্রব্যূহে প্রবেশ করল শিরিণ জাভেরি। আদর্শবাদের প্রকৃত সংজ্ঞা শিরিণের জানা নেই। জানার চেষ্টাও করেনি। নিজের বাড়িতে অত কাছে থাকা মা, অ্যানি ম্যাডাম, প্রমোদকাকা— এদের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। ক্রোড়পতির মেয়ে হয়েও আমার অহঙ্কার নেই, এটাই ওর অহঙ্কার ছিল। আদর্শের মিসইন্টারপ্রিটেশন ওর কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল। নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করা মানেই সাধারণ মানুষের পাশে থাকা ওদের একজন হয়ে— এই ভ্রান্ত ধারনা

ওর মনে একধরনের আত্মতৃপ্তি দিত। সেটাও অহঙ্কারেরই অন্য রূপ। এসব বিচার করার মতো এডুকেশনও নেয়নি, মগজও ছিল না। ছিল শুধু যা কিছু ভাল সেগুলোকে না বুঝে নস্যাৎ করার টেনডেন্সি। তাই অন্য মানুষের প্রয়োজনে ওর মার অবদান, ওর এবং ওর ফ্যামিলির জন্য মিস গোমস্‌য়ের অবদান, ড্রাইভার প্রমোদকাকার লয়েলটি— আদর্শের এতগুলো উদাহরণ চোখের সামনে থাকলেও ওর আত্ম-অহঙ্কারী চোখ এদিকে তাকিয়ে দেখেনি। ছোটবেলায় ডাংগুলি খেলার সঙ্গীদের হাতে বিদেশ থকে ড্যাডের নিয়ে আসা বাক্স বাক্স সুইস চকোলেটের থেকে একটা চকোলেটও দেওয়ার কথা মনে পড়ত না। বড় বেলাতে যখন মনীষা, দীপক, সিভাসের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হলো তখন ফুর্তি করার কারণে টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করেনি। টুয়েলভ ফাইনালের পরীক্ষার ফীজ-এর টাকা জোগাড় করতে না পারার জন্য যখন দীপকের পরীক্ষায় বসা প্রায় অসম্ভব হতে যাচ্ছিল, তখন সিভাস বেঞ্জামিন কোথা থেকে টাকা জোগাড় করে দীপকের ফীজ ভরেছে। ওরা শিরিণের কাছে হাত পাতেনি আর শিরিণ ওই ক'টা মাত্র টাকা দেবার কথা উচ্চারণও করেনি। এই হলো শিরিণের 'কমন পিপ্‌লের' প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বন্ধুত্বের পরিচয়। এককথায় হুজুগ বলাই ভাল। মাকে ভালভাবে জানার আগ্রহ কোনোদিনই ছিল না, শুধু রাগ, অভিমান আর বিদ্বেষ জমা করেছে। একটা সময় মা ওকে সময় দিতে পারেনি এই অপরাধ আজও মনে রেখে বাইরের মানুষের সামনে মার অপমান করতে ওর বাধে না। মা যে অধ্যবসায়, সাধনা, তপস্যার স্বাক্ষর রেখে নাম-যশ-সম্মানের শীর্ষস্থানে উঠেছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিন্দুমাত্র প্রকাশ ও নিজের জীবনে ঘটাতে পারেনি, ঘটাবার চেষ্টাও করেনি। মার প্রতি সুপ্ত ঈর্ষা মাকে সমাজের নজরে অসম্মানিত কলঙ্কিত করার প্ররোচনা দিয়েছে। টুয়েলভ ক্লাশের আই এস সি পরীক্ষা কোনোরকমে পাশ করে শিক্ষা জগতের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আঠারো বছরেই ব্যক্তি স্বাধীনতার ঝান্ডা তুলে স্বেচ্ছাচারী অধঃপতনের পথে পা বাড়ার ভুল কত বড় সর্বনাশ করতে পারে একথা বোঝার মতো পরিণত হয়নি ওর বুদ্ধি। ইচ্ছেমত হুজুগে মেতে থাকতে পারাকেই ও জীবনের সার্থকতা বলে বিশ্বাস করেছে আর সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়েই রোমির কাছে আত্মসমর্পণ।

— 'রোমি, ঠিক চারমাস আগে সেই নির্জন সি-বীচে আমি তোমাকে বিয়ে করব বলেছিলাম। তুমি সময় চেয়েছিলে। এখনও সময় হয়নি?'

— 'শিরিণ তুমি বড় ছেলেমানুষী করো। বিয়ে করে তোমাকে রাখব কোথায়? আমার রুপ-টপ অ্যাটিকের একটামাত্র রুমে যার বাথরুম বাইরে, সেখানে তোমাকে রাখা যায়? একটু ধৈর্য ধরতে হবে। রিয়েল এস্টেট বিজনেস এখন পিক-এ আছে জানো? এইসময় খেটেখুটে কিছু কামাই করতে পারলে একটা ছোট ফ্ল্যাট হয়ত হতে পারে। ওই অ্যাটিকের রেন্ট দিতেই জেরবার অবস্থা, ফ্ল্যাট ভাড়া করা তো এখন সম্ভবই নয়। আমি ফ্ল্যাট ভাড়া করতে চাইও না, কিনতে চাই। ধৈর্য ধরো, সব হবে।'

— 'দূর! আর কত ধৈর্য রাখব? চারমাস তো রেখেই চলেছি। তুমি টাকা জমাবে, তবে ফ্ল্যাট হবে, তখন বিয়ে হবে, বাহ্! বুড়ি হয়ে যাবো ততদিনে।'

রোমি হেসে বলে— 'তাতে কী? আমিও তো বুড়ো হব। বুড়ো-বুড়ির বিয়ে হবে। অ্যাই শিরিণ, আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। আমি ক'দিন খুব ব্যস্ত...'

— 'বাহানা না করে বলে ফেল। শিরিণ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে— গত চারমাসে পাঁচবার তোমার ক্যারিয়ারের কাজ করেছি। অমুক জায়গায় অমুককে এটা দিয়ে এসো, তমুক জায়গায় তমুকের কাছ থেকে পার্সেল নিয়ে এসো। আমি ব্যস্ত থাকব যেতে পারব না, প্লীজ তুমি ওই ছেলেটার বার্থ-ডে গিফ্ট দিয়ে এসো... বলে ফের এবার কাকে ক্যুরিয়ার পৌঁছতে হবে।'

— 'না, না। এবার ওসব নয়। একদিন এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ব্যাঙ্কক থেকে একজন লোক প্রথমবার বোম্বে আসবে। কিছু চেনে না। প্ল্যাকার্ড নিয়ে ওকে রিসিভ করে হোটেল শেরাটনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে— ব্যাস।'

— 'এটা আমি করতে পারব না। চিনি না একটা লোক দুবাই থেকে আসবে ওকে আমি কী করে নিয়ে আসব? নৌসাদ— আলমগীর এদের কাউকে পাঠাও।'

রোমি গম্ভীর হয়ে যায়। ভারী গলায় বলে— 'আনপড় গাওয়ারগুলোকে দিয়ে যদি হতো তাহলে তোমাকে বলতাম না। ওরা মারপিট করতে পারে, গ্যারেজের কাজ ভালই জানে, তাই বলে এয়ারপোর্টে গিয়ে বিদেশি মানুষকে রিসিভ করতে পারে না। ঠিক আছে... দেখি...'

— 'থাক। আর দেখতে হবে না। কবে যেতে হবে আগে বলে দিও।'

নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়ে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের ডিপার্চার গেটের সামনে 'ম: রশিদ আলহামিদ আবদুল্লাহ' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ল্যান্ড করেছে ঘোষণা হয়েছে। যাত্রীরা ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে আর কোনো প্যাসেঞ্জার বের হচ্ছে না বুঝল। লোকটা আসেনি নাকি? সব প্যাসেঞ্জাররাই প্ল্যাকার্ড হাতে ওকে পেরিয়ে গেছে, দেখেছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। রোমিকে ফোন করবে বলে মোবাইলে নম্বর ডায়ের করতে যাবে তক্ষুনি সিকিউরিটির লোক এসে জিজ্ঞেস করল— 'ম্যাম, আপনি কি ব্যাঙ্কক-বোম্বে ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছেন?'

— 'ইয়েস। এই জেন্টলম্যানের আসার কথা, কিন্তু মুশকিল হলো আমি ওকে চিনি না। প্যাসেঞ্জার তো সব চলে গেল মনে হচ্ছে।'

— 'আপনি আমার সঙ্গে ভেতরে চলুন।'

— 'ভেতরে বোর্ডিং পাস ছাড়া যাওয়া তো নিষেধ!'

— 'আমিই নিয়ে যাচ্ছি। আসুন।' — লোকটা এনট্রেন্সের দিকে ফিরে তাকাতেই খাকি শাড়ি পরা দুজন লেডি পুলিশ এসে পড়ল। বলল— 'চলুন ম্যাম।'— ওরা দুজন ওর পিঠে হাত দিতেই ভয়ানক আতঙ্কে কেঁপে উঠল শিরিণ। বুঝতে পারল এক মারাত্মক বিপদ ওকে অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরেছে।

আশ্চর্য এই যে রোমিও জিলানির ইনভলভ্‌মেন্ট কোনো মতেই প্রমাণ করতে পারল না নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্ট আর পুলিশ। রশিদ আলহামিদের স্যুটকেসের সিক্রেট বটম চেম্বার থেকে ব্রাউন সুগারের পাঁচ কেজি বেরিয়েছে, তাই সে মেন একিউজড্। পুলিশ শিরিণকে ২৪ ঘণ্টা ডিটেনশনে রেখে কোর্টে তুলল। প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়ানোটাকেই সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স ওর বিরুদ্ধে এই দায়ে নন-বেইলেবেল অফেন্সের চার্জে জুডিশিয়াল কাস্টোডি দিয়ে জেলে পাঠানো হল। বিচারেও একই অজুহাতে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে জেলে যেতে হলো। আসল অপরাধী রোমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শিরিণকে চিনতেই পারল না। ওর জাঁদরেল উকিল শিরিণকে ক্রস একজামিনের নামে নোংরা ইঙ্গিতে নাস্তানাবুদ করে বিপর্যস্ত করে রোমিকে বেকসুর প্রমাণ করে বের করে নিয়ে গেল। কোর্টে মম, ড্যাড আর অ্যানি ম্যাডামকে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখে শিরিণের অন্তরাত্মা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে হাহাকার করল, কিন্তু তখন আর ওদের ইজ্জত বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না।

সাইরাস হাইকোর্টে অ্যাপিল করেছে। ডেটের পর ডেট পড়ে শুধু শুধু। কেসও ওঠে না, হিয়ারিংও হয় না। পুলিশ ভ্যান থেকে শিরিণকে নিয়ে আসে-যায়। এভাবে তিন বছর শিরিণের জেলেই কাটল। সাইরাসকে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে হয়েছে। আনন্দ আর অ্যানি আসত দেখা করার জন্য। লোহার জালের ভেতরে শিরিণ মাথানত করে দাঁড়িয়ে শুধু শুনত, কথা বলত না, তাকিয়ে দেখত না। মম মুম্বাইতে থাকতে পারেনি, মিডিয়া প্রচারের আধিক্যে। ড্যাডের হেডকোয়ার্টার ম্যানচেস্টারে চলে গেছে ড্যাডের সঙ্গে। শিরিণ নীরবে আত্মদহনে পোড়ে আর এক গুপ্ত প্রতিজ্ঞাকে জ্বালিয়ে রাখে সেই আগুনে।

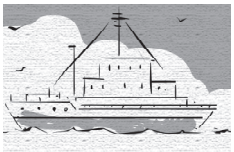

তিনবছর পর আজ শিরিণ বেবি নিজের ঘরে ফিরবে। অ্যানি জিশাসের বাঁধানো ছবির নীচে অনেকগুলো ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে বিশেষ প্রার্থনা করলেন। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ প্রমোদ চৌবের কপালে সিঁদুর, হলুদ, চালের টীকা বলছে সেও পুজোপাঠ করেই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। যাবার পথে সারাক্ষণ আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে গেলেন অ্যানি। চোখের জল কিছুতেই কথা শুনছিল না। তিন বছর সাধারণ কয়েদির স্ট্যাটাসে থেকেছে, প্রচুর খাটুনি খেটেছে জাভেরি ভিলার আদরে পালিত মেয়ে। সাধারণ পথের মানুষ সাজার শখ মিটেছে চরম মূল্য দিয়ে। এখন স্বাস্থ্য, রূপলাবণ্যের জৌলুশ কিছুই আর নেই। একেবারে খেটেখাওয়া পথে ফুটপাথে থাকা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের চেহারা হয়েছে একদা অসামান্য রূপসী মেয়ের। যারা এই চেহারায় ওকে দেখেনি তারা চিনতে পারবে না। একটা সেলে অন্য তিনজন ক্রিমিন্যাল মহিলার সঙ্গে থাকতে হয়েছে, জেলের অখাদ্য খেতে হয়েছে বাঁচার জন্য। শাস্তি ওর দরকার ছিল, ভুল চিন্তাধারাকে ঠিকানায় আনার জন্য, কিন্তু যে অপরাধ ও করেনি সেই দোষে অনেক বেশি শাস্তি ভোগ করতে হলো। হয়তো ভালোর জন্যই হলো। এরপর আর কোনো ভুল করবে না। সাইরাস স্যাররা এখানে চলে আসবেন পাকাপাকি। নারকোটিক্স মামলার কনভিক্ট শিরিণ ইউ কে

ভিসা পাবে না। মেয়ের জন্য রিটায়ারমেন্টের আগেই চাকরি ছেড়ে চলে আসবেন। মেয়ে হয়তো এবার নতুন করে গড়বে নিজেকে। অ্যানি প্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই করে শিরিণকে নিতে জেলে এসেছেন।

দীর্ঘ তিন বছর পর নিজের রুমে ঢুকে লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। তারপর ঘরে চারিদিকে ঘুরে দেখল। যেমন রেখে গিয়েছিল সব তেমনি আছে, শুধু ও বদলে গেছে চেহারায়, ভাবনায়, চরিত্রে। ওর মনের ভেতরের জ্বালিয়ে রাখা আগুন বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে লকলক করে জ্বলছে এখন। গালিচায় বসে বুককেসের নীচের ড্রয়ার খুলে পুরনো টেলিফোন ডায়েরিটা পেয়ে গেল। একটা জিনিসও কেউ ঘাঁটেনি। স্থান বদল করেনি। পুলিশ সঙ্গে যা ছিল সব নিয়ে নিয়েছিল। আজ জেলার লিস্ট মিলিয়ে জামাকাপড়, ঘড়ি, কানের টপ, চেন, মোবাইল— সব ফেরত দিয়েছে। সঙ্গে তিনবছরের কাজের দিনমজুরি। যা ফেরত দেয়নি সেটা ও আর ফেরত চায় না— পেছনে ফেলে আসা জীবন। হাইকোর্ট এবার ওকে বেকসুর বলে ঘোষণা করেছে। তিন বছর নরকবাস নরক যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে আগত দিনে যা কাজে লাগবে। এখন সবচেয়ে আগে দরকার ভালো করে স্নান। এই শরীরে যত নোংরা যত ক্লেদ জমেছে সব ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

জেলের ভেতর জেল, মেয়েদের জেল। সোশাল স্ট্যাটাসের উদাহরণ দিয়ে ওর ল-ইয়ার জজকে আবেদন করেছিলেন ওকে সিঙ্গেল সেল দেবার জন্য। জজ আবেদন খারিজ করে দিলেন। জজ যেন জন্মান্তরের কোনো শত্রু বলে মনে করেছিলেন ওকে, তাই ওর বেলের আবেদন, একেবারে অচেনা বলেই প্ল্যাকার্ড নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো ওর বিরুদ্ধে এভিডেন্স হতে পারে— এই যুক্তিও খারিজ করেছেন। পুরনো পাপী দাগি আসামিদের সঙ্গে একই সেলে ওকে রাখার আদেশ করেছেন। এই সেলেই ও প্রথম জানতে পারে, আন্ডারওয়ার্ল্ডে শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও

যুক্ত আছে। মধ্য বয়সী হামিদা বাঈ ওরকম একজন মহিলা। হামিদা বাঈ না থাকলে ও বাঁচতে পারত না। খুনের আসামি হামিদাকে অন্যরা দারুণ ভয় করত সেটা ও দেখেছে। খুনের আসামির প্রাণে এত মমতা থাকতে পারে হামিদাকে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব হতো। মৌসি বলে ডাকতে ভাল লাগত ওর, মনে হতো এই নরকে অ্যানি ম্যাডামের মতো আর একজন মেসিহা হয়ে ওকে রক্ষা করার জন্য আগে থেকেই এসে বসে আছে।

বোম্বের অন্ধকার জগত নিয়ে কোনো কৌতূহল ছিলই না কখনো। জানত না আন্ডারওয়ার্ল্ড কাকে বলে। মৌসি ওকে বলেছিল, আন্ডারওয়ার্ল্ডও একটা ফ্লারিশিং ইন্ডাস্ট্রি। লক্ষ লক্ষ হাজার কোটির ব্যবসা চলে সেখানে। পুরোটাই অসৎ উপায়ে। ঘাঘু অপরাধীদের গোপন সাম্রাজ্য শুধু দেশের ভেতরে নয়, পৃথিবীর সব দেশে বিস্তৃত। গ্যাং লিডারের সংখ্যাও কম নয়। অপরাধ জগতে একবার ঢুকতে পারলে সহজে প্রচুর কামাই করা যায়, অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত তরুণরা আকৃষ্ট হয়ে কোনো না কোনো গ্যাংয়ে ঢুকে পড়ে। বড় বড় গ্যাংয়ে কয়েক হাজার কর্মী কাজ করে। ছোটখাটো গ্যাংয়ে সংখ্যাটা শয়ের ঘরে থাকে। বোম্বের প্রথম বিখ্যাত মাফিয়া ডন ছিল হাজি মস্তান। অপরাধের বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতান। সে তোমাদের জন্মের বহু আগের কথা বিটিয়া! হাজি মস্তান একাই তখন অধিপতি, অন্য কাউকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই দিত না। পুলিশের হিম্মত ছিল না ওর মাথার একটা চুলে হাত লাগায়। রাজনীতির বড় মাপের নেতা, বড় বড় শিল্পপতি, ফিলমি দুনিয়া ওর কদর করত খুব — অবশ্যই নিজেদের স্বার্থে। সে শাহেনশার মতো থাকত। সোনা বহুমূল্য হীরা জহরত, বিদেশি অস্ত্র বিদেশি জাল নোট, চরস — এইসব নিয়ে কারবার করত। ছোটখাটো খুনজখমে অরুচি ছিল ওর, মশা মেরে হাত নোংরা করেনি।

হাজি মস্তানের জমানা শেষ হতেই ওর শূন্য সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হল। বিশাল সাম্রাজ্য দখলের রক্তাক্ত লড়াই চললো অপেক্ষায় থাকা উঠতি তরুণ মস্তানদের মধ্যে। টুকরো টুকরো করে এলাকা ভাগ করে ফেলল ওরা যার যার নামে। জানো বেটিয়া, আন্ডারওয়ার্ল্ডেরও কিছু নিয়ম থাকে, ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয়। একমাত্র দাউদ ইব্রাহিম ছাড়া বাকি সবাই মশা-মাছি মেরে হাতগন্ধ করতে ইতস্তত করেনি, যার ফলে 'ডন' হতে চেয়েও ওরা ক্রিমিনাল হয়ে থেকে গেল। আর ধূর্ত দাউদ ধৈর্য ধরে এক পা এক পা করে এগিয়ে একদিন হাজি মস্তানের থেকেও বড় মস্তান হয়ে আমাদের দেশ তো বটেই বিদেশের কাছেও আতঙ্কের বস্তু হয়ে গেছে। হাজি মস্তানের থেকেও হাজারগুণ বড় সাম্রাজ্য বানিয়ে ফেলেছে পড়োশি দেশ পাকিস্তান-দুবাই এসব জায়গায়।

আমি এক মাঝারি মাপের গ্যাংয়ে কাজ করি। সেলিম পাশা আমাদের গ্যাং লিডার। জানো, পুলিশ কিন্তু সব জানে, কিন্তু মারাত্মক ঘটনা না ঘটালে পুলিশ ফিরেও তাকায় না। কেন বল তো? পুলিশের সঙ্গে প্রত্যেক গ্যাং লিডারের মাসকাবারি বন্দোবস্ত থাকে, তাই। মারাত্মক ঘটনাও অনেক সময় পুলিশকে নজরআন্দাজ করতে হয় বাধ্য হয়ে। রাজনীতির নেতারা অ্যাকশন নিতে দেয় না পুলিশকে। দাঙ্গা-ফাসাদ লাগাতে আমাদের দরকার, ভোটের সময় তো আমাদের ছাড়া চলবেই না নেতাদের। তোমার ওই রোমি জিলানি কোনো বড় মস্তান হয়নি এখনও। ওর নিজের কোনো এলাকা নেই। ওর বাপ আসরাফের তবুও একটা ছোট গ্যাং আছে মালাড অঞ্চলে, কিন্তু রোমির বাপের সঙ্গে বনিবনা নেই। আমাদের বস সেলিম পাশার মেয়েকে নিকাহ করেছিল রোমি। মোহব্বত করে নিকাহ। সেলিম ভাই ভেবেছিল আসরফের ছেলে, রক্তে ক্রাইম আছে, দু'বার গয়নার দোকান লুঠ করেছে নিখুঁত প্ল্যান করে। দামাদ করলে সেলিম ভাইয়ের কাছে এসে উন্নতিই করবে। দেখতে ভাল, হিন্দি, ইংরাজি ভাল বলতে পারে। অনেক কাজে লাগবে দামাদ। কিন্তু রোমি শ্বশুরের হাতে হাত মেলালো না। ও স্বাধীনভাবে নিজের গ্যাং বানাতে চায়। বাপ বলো শ্বশুর বলো কারও অধীনে থাকবে না, ব্যাস। গণ্ডগোল বাঁধল। রোমি বিবি-বাচ্চা ছেড়ে একা থাকতে শুরু করল। গয়নার দোকান লুঠের টাকায় ড্রাগের ব্যবসা করে টাকা কামিয়ে আর্মসের ব্যবসাও সঙ্গে জুড়ে সবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বিবিকে বেদম পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বড় শালা সরফরাজ রোমিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। বিবি নাসিফাই বাধা দিয়েছে। আমি ভদ্রলোক নই, ভাল মানুষও নই। আমারও রক্তে অপরাধের বীজ আছে কিন্তু একটা গুণ আছে আমার। আমি বিশ্বাসঘতকতা করি না। অনেক বড় বড় গ্যাং আমাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, লোভ দেখিয়েছে, কিন্তু আমি সেলিম ভাইকে ছেড়ে যাইনি। আমার চরম দুর্দিনে সেলিমভাই ছাড়া কেউ সাহায্য করেনি। জানো, আমি কাকে খুন করেছিলাম?

আমার শোহোরকে (স্বামীকে)। ঐ লোকটা সারাজীবন সকলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সবচেয়ে বেশি করেছে আমার সঙ্গে। ওকে খুন করে নিজে এসে পুলিশে ধরা দিয়েছি, তা না হলে পুলিশ আমাকে ধরতে পারত না। মরেও ও বলতে পারবে না আমি বিশ্বাসঘাতক।

বাথটবের একরাশ ফেনা ছেড়ে উঠে পড়ে শিরিণ। অনেক কাজ আছে। শুধু ভাবলে চলবে না, হামিদা মৌসি তিন বছর ধরে ওকে পইপই করে বলেছে— বোকার মতো কাজ আর করো না। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করো, ঝুঁকি না নিয়ে। আমার মেয়াদ শেষ হতে চলল, তোমার আগে আমি বেরিয়ে যাবো। মোবাইল থেকে কিংবা বাড়ির ল্যান্ডফোন থেকে কখনো ফোন করো না। রাস্তার পাবলিক টেলিফোন কিয়স্কে কয়েন ফেলে ফোন করবে। ট্রেইল থাকবে না। তোমার নাম বলবে না, যে নম্বর দিয়ে যাবো সেই নম্বর বললেই আমি বুঝব তুমি ফোন করছ।

স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে মনে হলো এতক্ষণে যেন ও আবার শিরিণ জাভেরি হলো। জেলে শিরিণ নয়, ওর পুঁতিগন্ধময় প্রেতাত্মা থেকেছে তিনবছর। পুঁতিগন্ধ চলে গেছে, শরীর থেকে এখন মিষ্টি সুগন্ধ বের হচ্ছে। প্রেতাত্মা ছেড়ে দিয়েছে ওকে। মিস গোমসের রুমের দরজায় এসে নক্ করে বলল— 'ভেতরে আসব?' —'ইয়েস, ইয়েস বেবি। কাম ইন।' — ভেতর থেকে বললেন অ্যানি।

— 'অ্যানি ম্যাডাম, আমি একটু মেন রোডে যেতে চাই। যাবো?'

— 'নিশ্চয়ই যাবে, প্রমোদ নিয়ে যাবে। বসো, দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

বসল ও। তারপর সংকোচে বলল— 'আপনাদের সবাইকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। বিশেষ করে মমকে। আমার নির্বুদ্ধিতার ফল আমি পেয়েছি, এখন প্রায়শ্চিত্তের পালা।'

অ্যানি বললেন— 'কনফেশনই প্রায়শ্চিত্ত। প্রভু তোমাকে ক্ষমা করেছেন মাই চাইল্ড। আমেন!'

— 'কাকা আমাকে একটা পাবলিক টেলিফোন বুথে নিয়ে চল।'

— 'বাড়িতে থাকতে রাস্তার বুথে কেন যাচ্ছে?'

— 'জেলে আমাকে একজন মায়ের মতো যত্ন করেছে কাকা। সে দেড়মাস আগে ছাড়া পেয়ে চলে গেছে। পাবলিক কিয়স্ক থেকে ফোন করতে বলেছিল।'

— 'কয়েন নিয়েছ?'— 'হ্যাঁ অনেকগুলো নিয়েছি।' বলে শিরিণ।

কয়েনের বটুয়ার মুখ খুলে সামনে রেখে হাতের তেলোয় লিখে আনা নম্বর ডায়েল করেই কয়েন ফেলে শিরিণ। রিং হচ্ছে। একটু পরেই ওপার থেকে — 'হ্যালো।' — গলার স্বর ওই হ্যালো বলাতেই চিনতে পারে ও। —'৭৭৮৮০০।'

— 'হ্যাঁ বেটিয়া! ঘরে এসে গেছ! এই দেড়মাস কেউ তং করেনি তো?'

— 'আজই এসেছি মৌসি। না, কেউ খারাপ ব্যবহার করেনি। তোমাকে খুব মিস করেছি, এখনও করছি। তুমি কেমন আছো।?'

— 'ভালো। তোমার কাজ হয়ে গেছে নির্ঝঞ্ঝাটে, এবার নিজের দিকে মন দাও।'

— 'হয়ে গেছে?'— অবাক গলায় প্রশ্ন করে ও। —'আমি কবে তোমার কাছে যাব?'

— 'কাল বিকাল পাঁচটায় চৌপট্টি বীচে নারিয়াল পানি খেয়ো। এখন রাখছি।'

হামিদা বাঈ চোখের ঈশারায় ওকে সমুদ্রের দিকে যেতে বলেছিল। ভিজে বালির একটু ওপরে সামান্য দূরত্বে বসেছিল মৌসি। বলেছিল— 'জেলের ভেতরের নিরাপদ জায়গা নয় এটা। দুই মেরুর দুজনের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা দেখলে ভুরু কোঁচকাবে লোকেরা। শোনো, যে বিশ্বাসঘাতক তোমার আর নাসিফার জীবন নষ্ট করেছে সে এখন নেই। তুমি বেরিয়ে আসার পর পাছে কেউ তোমার দিকে আঙুল তোলে একথা ভেবেই আগে করতে হয়েছে। বিস্তৃত ঘটনা জানতে চেয়ো না। সে নেই বলে কোথাও তেমন আলোড়ন হয়নি। বোম্বের অপরাধীরা রোজই কেউ না কেউ হারিয়ে যায় দলবাজি করতে গিয়ে। কেউ মাথা ঘামায় না এসব ছোট ঘটনা নিয়ে।

— 'আমি আজ ঘরে যা ছিল সেই চল্লিশ হাজার নিয়ে এসেছি। যা বাকি থাকবে২-৩ দিনের মধ্যে এই জায়গায় এসে দিয়ে যাবো।'

হামিদা বলল— 'অযথা ব্যাগ খুলো না এখানে অত টাকা নিয়ে। এক পয়সাও দিতে হবে না। সরফরাজ তোমাকে চেনে না, নাম পরিচয়ও জানে না। ওকে শুধু তোমার ঘটনার কাহিনিটুকু শুনিয়েছি। ও বলেছিল, আর নয়। পরপর দুটো ভাল মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যে লোক সে আবার করবে। সরফরাজ কাজটা নিজের বোনের আর অচেনা মেয়ে তোমার প্রতি ওর ফর্জ

মনে করে পাপ বিদায় করেছে। শিরিণ বেটিয়া আজকের পর আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করো না। সাড়া পাবে না। নিজের সভ্য সমাজে ভালোভাবে থেকো। সেটাই তোমার স্থান। আমাকে আমার স্থানে থাকতে দিও।' — চলে যাবার জন্য উঠে পড়ল হামিদা।

— 'মৌসি একটা কথা শুধু বলে যাও প্লিজ! তুমি, সরফরাজ— তোমরা কি সত্যিই ক্রিমিনাল?'

— 'হ্যাঁ বেটিয়া! খুঁজলে কিংবা সংযোগ ঘটলে লাখে একটা-দুটো দিলওয়ালা ক্রিমিনাল হয়ত পাওয়া যাবে, আখির মানুষই তো আমরা।'

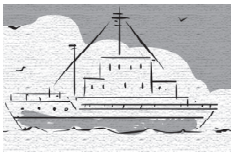

THE GIRL OF OLD COURT YARD - Shirin Zaveri

— 'শ্রাবণী শিগগির এসো! দেখ এসে খবরের কাগজে কী বেরিয়েছে— অজিতের চিৎকারে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে ছুটে এলো শ্রাবণী।

— 'এই দেখ, আমাদের শিরিণ বই লিখেছে। রুপা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে। প্রথম বই 'বুকার্স' পুরস্কার পেয়ে বেস্ট সেলার হয়েছে গো! ওর নিজের জীবনকাহিনি লিখেছে। মাত্র ছাব্বিশ বছরে বুকার্স পুরস্কার— এ্যাঁ! ভাবা যায় বল?'

— 'ভাবা যাবে না কেন? কার মেয়ে দেখতে হবে তো! সোনার প্রতিভা ওর মধ্যে এসেছে। অভিনয় নয়, একেবারে সাহিত্য হয়ে! ইংরেজিতে লিখেছে যে, হ্যাঁগো, আমি তো ভাল করে বুঝব না, পড়তে পারলেও। কী হবে?'

অজিত বুকে হাত রেখে গর্বিত মুখে বলল— ' The girl of old court yard বাহ্! বাহ্! — নে শালারা, খুব হেটা করেছিলি আমাকে। দ্যাখ কাগজ পড়ে, সাইরাস-দেবাঙ্গনার সঙ্গে grand daughter of Ajit Kumar Mukherjee, Kolkata— ছাপিয়েছে কাগজে। দু-দুখানা প্রতিভার উৎস এই অজিত মুখার্জী, হ্যাঁ। অবশেষে মেয়েটা ভুল বুঝতে পেরে ঘোলা জল ছেড়ে উঠে এসেছে। মান-সম্মান পুনরুদ্ধার করে এমন জায়গায় বসে পড়েছে যেখান থেকে আর কোনোদিন নিচে নামার চান্স নেই। এখন শুধুই উপরে ওঠা, আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখবে তোমার নাতনি— আর ভয় নেই শ্রাবণী।'

With Best Compliments from -

A
Well
Wisher

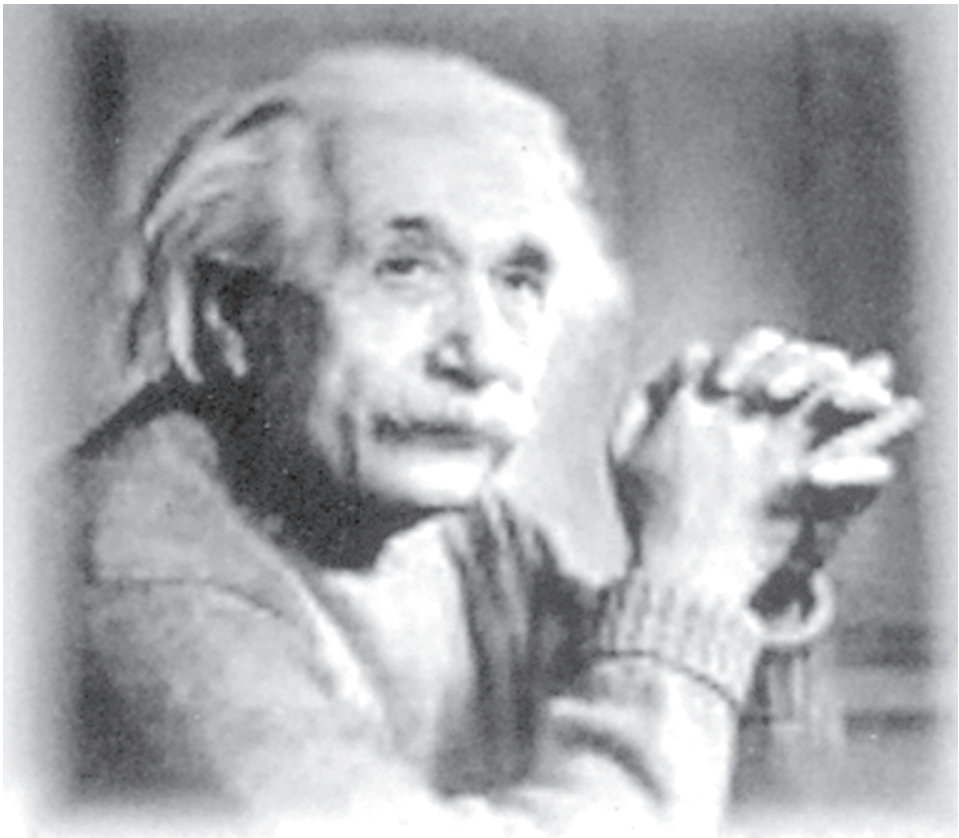

আইনস্টাইনের ঈশ্বর ও ধর্মভাবনা এবং বেদান্ত

দেবীপ্রসাদ রায়

আইনস্টাইনের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিপুল কৌতূহল সেই ১৯০৫ সাল থেকে, যখন হঠাৎ করেই পদার্থবিদ্যার গবেষণার যুগান্তকারী কাজের সূত্রে আইনস্টাইন দৃশ্যমান হয়ে উঠলেন। আলোক তড়িৎ-বিক্রিয়ার কোয়ান্টাম ব্যাখ্যা, আলোর গতিবেগের নির্দেশতন্ত্র, নিরপেক্ষ ধ্রুবকত্ব এবং ভরশক্তির তুল্যমূল্যতা ব্যবহারিক জীবনেও বিপুল ঘাত

(Impulse) তত্ত্বের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রবক্তা হয়ে নিউটনীয় যুগের অবসান ঘটালেন মহাকর্ষ তত্ত্বের তিন ভাষ্য প্রদান করে। কৃষ্ণগহ্বর, মহাজাগতিক লেনস ও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ— এই তিন অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়ে যা সব এক এক করে প্রমাণিত হল এবং সর্বশেষ চমক মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়ল শতবর্ষ পরে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে--- LIGO [Laser Interferometer Grabitational wave observatory] নামক যন্ত্র ব্যবস্থায়।

সৌরজগতের এই বিস্ময়-বিজ্ঞানীকে নিয়ে অনেক কৌতূহল আছে— বিজ্ঞান ছাড়াও বিপুল বিস্তৃত সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ঈশ্বর ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীদেরও এই বিষয়টি কালাতীত ভাবে বরাবরের আলোচ্য তর্ক-বিতর্ক ও অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে এসেছে। এতবড় বিজ্ঞানীর কী দৃষ্টিভঙ্গি এই বিষয়ে কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সম্প্রতি নিলামে ওঠা আইনস্টাইনের কিছু এযাবৎ অপ্রকাশিত চিঠি সামনে আসায় আইনস্টাইন অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছেন। আমেরিকার 'প্রোফাইলস্ ইন হিস্ট্রি' নামক এক সংস্থা, যার প্রেসিডেন্ট যোশেফ ম্যাডিলেনা জানিয়েছেন ২০১৫ সালের মে মাসে, ...'আইনস্টাইনের হাতে লেখা অতিচমৎকার এক ঝাঁক চিঠি আমরা একত্রিত করেছি। অন্তরের গভীর চিন্তাভাবনার বর্ণনা রয়েছে এই চিঠিগুলিতে, বিভিন্ন বিষয়ে। এগুলি ওই পদার্থবিজ্ঞানীর গোটা জীবনের কাজকর্মের প্রতিরূপ।' ঈশ্বর, বিজ্ঞান, ধর্ম ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্বে এই মুহূর্তে বিরাজমান এবং ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে অর্থবহ। এই জন্যই আইনস্টাইনের চিঠিগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

বিজ্ঞান ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার শুরুতে আইনস্টাইনের কয়েকটি মন্তব্য দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

আইনস্টাইনের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই তত্ত্বকে তিনি নিজেই কখনো মেনে নেননি। প্রথম সলভে কংগ্রেসে (১৯১১) তিনি বলেছিলেন, পরিপূর্ণতা পাবার জন্য অপেক্ষমান এই তত্ত্ব একটি সাময়িক ভাষ্য মাত্র।

১৯২৬ সালে ম্যাক্স বর্নকে তাঁর কিছু চিঠির উত্তরে আইনস্টাইন লিখলেন— "Quantum Mechanics is impressive. But an inner voice takes me that it is not yet the real thing. The Theory produces a good deal but hardly brings us closer to the secret of the old one, I am, at all events, convinced that He does not play dice"। অন্তরের কণ্ঠ বিজ্ঞান স্বীকৃত নয়, কিন্তু বলছেন আইনস্টাইন। এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তি আমরা পরে দেখব, আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধর্মেরই প্রতিফলন।

১৯৪১ সালে 'নেচার' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে আইনস্টাইন জানালেন ধর্ম বিনা বিজ্ঞান খঞ্জ এবং বিজ্ঞান বিনা ধর্ম অন্ধ। অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়কেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন। একসময় আইনস্টাইন বলেছেন, '... জড় জগতের প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'ধর্মীয়' শব্দটির পরিবর্ত কোনো পরিভাষা পেলাম না। সব মানুষের কাছেই শব্দটির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার এই অনুভূতিটুকু চলে গেলে বিজ্ঞান হয়ে যাবে শুষ্ক জ্ঞানের আকর মাত্র।'

ধর্ম এবং ধর্মের সঙ্গে এক ঈশ্বর সংযুক্তির জন্য আইনস্টাইনের 'ধর্ম' উচ্চারণ নিয়ে কেউ কেউ ভ্রুকুঞ্চিত করবেন বলেই হয়তো আইনস্টাইনের ওই উক্তি।

আইনস্টাইন নিজেকে স্পষ্ট করেছেন, "I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fate and actions of human being"। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ তাঁর ঈশ্বর নিয়ে তিনি আরও স্পষ্ট হয়েছেন এক চিঠিতে—

"Mr Gay N. Raner Jr.
6850 Ehimineas Avn.
Rescda Cal.
Dear Mr. Raner,

I see with pleasure from your letter of the 28th that year convictions are near to my own. Justifying your second judgement I all through say you to use my letter of July 1941 in any way.... fit. I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is a childish one. You may call me as agnostic but I do not share the crusading spirit of the professional atheist whose fervour is mostly due to a painful act of lineration from the fetters of religious indoctrination received in youth. Prefer an attitude of humility corresponding

to the weakness of our intellectual understanding of nature and of our own belief.

Sincerely yours
A. Einstein

এটা আইনস্টাইনের হঠাৎ কোনো ভাবাবেগের ফলশ্রুতি নয়। আইনস্টাইন দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞান, তাঁর ধারণার ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে আলোড়িত ছিলেন। তাঁর ৫০তম জন্মবার্ষিকী (১৯২৯)-তে এক জাপানি পণ্ডিতকে লিখেছিলেন, Scientific research can reduce superstition by encouraging people to think and view things in terms of cause and effect. Certain it is that a conviction alkin to religious feeling of the rationality and intelligibility of the world lies behind the scientific work of a higher order.... This firm belief bound with a deep feeling in a superior mind that reveals itself on the world of experience, represents my conception of God. In common parlance this may be described a pantheistic (Spinoza)।

১৯৩০ সালে 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর এক লেখায় আইনস্টাইন ধর্মীয় বিশ্বাস ভয়, সামাজিক নৈতিকতা এবং এক মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতিকে, যা তিনটি মানবিক ঘাত (impulse) হিসেবে বিকশিত হয়, তা চিহ্নিত করেছিলেন। কারণত্বের এক আদিম বোধের জন্যই ভয় এবং তাদের মতো অস্বাভাবিক ভয়প্রদ ঘটনার উদ্ভব হয়। প্রেম এবং সমর্থনের ইচ্ছাই পরম কিছুর সামাজিক এবং নৈতিক প্রয়োজন সৃষ্টি করে। এই দুটি ধরনেরই আছে এক নৃতত্ত্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণার ঈশ্বর। তৃতীয় ধারণটি যা আইনস্টাইন খুবই পরিণত মনে করেন তার উৎপত্তি এক গভীর ভয় এবং রহস্য থেকে। তিনি বলেন, প্রত্যেকে উপলব্ধি করে, মহত্ত্ব ও চমৎকার ধারা যা প্রকৃতিতে তাদের প্রকাশ ঘটায় এবং তিনি চান ব্রহ্মাণ্ডকে একক তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্র হিসেবে। আইনস্টাইন বিজ্ঞানকে দেখেছিলেন— ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রথম দুটি ধরনের বিরোধী হিসেবে, কিন্তু তৃতীয়টির ভাগীদার হিসেবে তিনি বহন করে গেছেন। যদিও ধর্ম এবং বিজ্ঞান ক্ষেত্রগুলি নিজেদের মধ্যে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত পরস্পর থেকে, তবুও পরস্পরের মধ্যে তীব্র অনুবর্তিতা ও নির্ভরতা বিদ্যমান সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা ধর্মীয় বৃত্ত থেকে আসে বলে। আইনস্টাইন তাই মনে করতেন, ব্যক্ত করেছেন ধর্ম বিনা বিজ্ঞান খঞ্জ, বিজ্ঞান বিনা ধর্ম অন্ধ। এই মুহূর্তে বিস্তারিত ভাবে না হলেও সহজেই উপলব্ধি করা যায়, বৈদান্তিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে এবং সেজন্যই বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উপলব্ধিও এসে পড়ছে। আমরা জানি যে ধর্মীয় শিক্ষা তাঁর বাল্যকালকে আবিষ্ট করেছিল। বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে তিনি সেই বাল্যাবস্থার মূল্যায়ন করেছিলেন— "It is clear to me that (this) last religio paradise of youth was a first attempt to liberate myself from the only personal"। তিনি দেহ এবং আত্মাকে বিজ্ঞানের জন্যই দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দর্শনের সংস্পর্শে এসে বিশেষ করে এক ব্যতিক্রমী ডাচ দার্শনিক বারুচ স্পিনোজার দর্শনের সংস্পর্শে এসে বাল্য কৈশোর ও উত্তর কৈশোর ভাবনা-চিন্তার রসায়নে এক নবতর একান্ত নিজস্ব ঈশ্বর ধারণার উদ্ভব হল। স্পিনোজার দর্শনে অনির্দেশ্যবাদের ঠাঁই নেই। স্পিনোজার দর্শনে অভিব্যক্ত হয়েছে— "...nothing in nature is by chance. Something appears to be chance only because of our lack of knowledge"। এই স্পিনোজাকে কিন্তু আইনস্টাইন গ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্যই তিনি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানকে তার অনিশ্চয়তার উপর নির্ভরতার সূত্রে গ্রহণ করতে পারেননি। আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বকেও মেনে নিতে পারেননি আমৃত্যু। ১৯৫১ সালে তাঁর প্রিয় বন্ধু মাইকেল বেসোকে লিখেছেন, "Die ganzen 50 sahre be wnsster Griibeleihaben nich der Antword der Frage 'was sind Lichtquanten' inent naher gebracht." - All these fifty years of pondering have not brought me any closer to answering the question what are light quanta?

আবার কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক সুষমাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। দ্বিধাদ্বন্দ্বে অস্থির আইনস্টাইন এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন ১৯৫৪ সালে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে— "I must seem like an Ostrich who forever burrics its head in the relativistic sand in order not to face the evil quantum"। আইনস্টাইনের জীবনীকার অনেকেই বলেন, এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও তাঁর সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়নি। তা কিন্তু মনে হয় ঠিক নয়। সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। আইনস্টাইন স্বীকার করেছেন— "I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns him-

self with the fates and actions of human being"।

আবার দার্শনিক এরিক গুটকিন্ড তাঁর বই 'Choose life : The Biblical call to revolt' আইনস্টাইনকে পাঠান। আইনস্টাইন তার উত্তরে (৩।১।১৯৫৪) গুটকিন্ডকে যা লিখেছিলেন তার খন্ডাংশ,

''প্রিয় মি: গুটকিন্ড

ব্রাউওয়ারের পুনঃ পুনঃ অভিভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আপনার বইয়ের অনেকটাই পড়েছি এবং আমার জন্য এটি ধার দেওয়ায় অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাকে যা নাড়া দিয়েছে তা হল এই— জীবন ও মানব গোষ্ঠীর প্রতি ঘটনাভিত্তিক মনোভাব সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই একইরকম করণীয় আছে। অহং বিন্যস্ত ইচ্ছা সকল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসের জন্য, জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করার জন্যই এটি বিশুদ্ধ মানবিক উপাদান নিয়ে আমাদের 'অ-আমেরিকান' মনোভাবের মধ্যে এক করেছে।... ঈশ্বর শব্দটি আমার কাছে মানুষের দুর্বলতার ফসল এবং প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। বাইবেল হলো, মাননীয় হলেও কতকগুলি নিছক আদিম কিংবদন্তীসমূহের সংকলন, যা নিতান্ত বালসুলভ। কোনো ভাষ্য তা যতই সূক্ষ্মদর্শী হোক না কেন, আমার এ ধারণার পরিবর্তন ঘটবে না। আমার জন্য ইহুদি ধর্মও অন্য সব ধর্মের মতো বালসুলভ কুসংস্কারের মূর্ত রূপ মাত্র। .... একদিকে একজন ইহুদি হিসেবে আপনি কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে আহরিত একটা বিধানের দাবি তুলছেন, যা অন্যথা স্বীকৃত। অন্যদিকে একজন ইহুদি হিসেবে আপনি একেশ্বরবাদের বিশেষ অধিকার দাবি করছেন। কিন্তু সীমিত কার্যকারণ সম্পর্কে আর কার্যকারণ থাকে না মোটেই। যেমনটা আমাদের বিস্ময়কর স্পিনোজা গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে স্বীকার করে গেছেন সেই কথা সম্ভবত সর্বপ্রথম। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধর্মগুলির প্রাণায়নিত ব্যাখ্যাগুলি, কিন্তু নীতিগতভাবে একচেটিয়াকরণের দ্বারা বাতিল হয়ে যায় না। এই ধরনের দেওয়াল তুলে আমরা কেবলমাত্র এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা অর্জন করতে পারি, কিন্তু আমাদের নৈতিক প্রয়াসগুলি তার দ্বারা লাভবান হয় না, বরং উল্টোটাই হয়।

এখন যে আমরা বৌদ্ধিক প্রত্যয়গুলিতে আমাদের পার্থক্যগুলির কথা সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে বলেছি, এটা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার যে আবশ্যিক বিষয়গুলিতে আমরা খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছি, অর্থাৎ মানবীয় আচরণের মূল্যায়নে। আমাদের যা আলাদা করে রেখেছে তা শুধুমাত্র ফ্রয়েডের ভাষার বৌদ্ধিক ধর্ম এবং যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়াস। সুতরাং মনে হয় আমরা যদি সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের কথা বলি, তাহলে পরস্পরকে আমরা অনেক ভালভাবে বুঝতে পারব।

সৌহার্দ্যপূর্ণ ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা সহ—

আপনার এ আইনস্টাইন।

God বা ঈশ্বর নিয় আইনস্টাইনের ভাষ্য যা জানা গেল এযাবৎ তাতে স্পিনোজা আভাসিত ঈশ্বরের রকমফের বাদ দিলে অনেকেই আইনস্টাইনকে নাস্তিক বলবেন। কিন্তু আইনস্টাইন রেগে যেতেন। Rabbi Herbest S. Goldstein-এর এক প্রশ্নের উত্তরে আইনস্টাইন মতামত দিয়েছেন— "I am not an athiest and I don't think I can call myself a Pantheist. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have asitten these books. It could not know how, It does not understand the languages in which they are written. The child deeply suspects a mysterious order in the arrangement of the books but does not know what it is. This, it seems to me is the attitude of even the most intelligent human being toward God"।

অনেক নাস্তিক তাদের সমর্থক হিসেবে আইনস্টাইনকে উদ্ধৃত করত। তাদের প্রতি তিনি বলতেন— "In the view of such harmony in the cosmos which I within my limited human mind am able to recognise them as yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views"। ডিসেম্বর ১৭, ১৯৫২-র একটি চিঠিতে Betrice Frohuch-কে আইনস্টাইন লিখেছেন— "It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I can not take seriously. I feel also not able to imagine some will or goal outside the human spere. My views are near to those of Spinoza admiration for the beauty of and belief in the logical"। আবার ১৯৫৪ সালে এক অধিবেশনে আইনস্টাইন

দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনচর্যায় দ্বিচারিতার কোনো স্থান ছিল না। তাহলে তিনি কি আস্তিক ছিলেন? আসলে তিনি মানবধর্মের পূজারি ছিলেন— মানবধর্মের প্লাবনে প্লাবিত সাধারণ মানুষ তিনি আস্তিক কী নাস্তিক সে নিয়ে মাথাই ঘামাত না। এই আলোতেই আইনস্টাইনকে দেখতে হবে। ১১ জুন, ১৯১৫, যখন চিঠিগুলির নিলাম হল, 'ওয়াশিংটন পোস্ট' জানাল ২৭টি চিঠি আছে যাতে কারো কারো মতে তাঁকে নাস্তিক চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে আইনস্টাইন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ জুয়িশ কংগ্রেসের একজনকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছেন (World Jewish Congress 1950)।

Dear Mr. Waras,

A human being is a part of the whole called as Universe a part limited in time and space. He experiences as himself, his thought and feelings as something separated from the rest --- a kind of optical delusion of his consiousness. The attriving to free oneself from this delusion is the one issue of true religion. Not to nourish the delusion but to try to overcome it is the way to reach the attainable measare of peace of mind.

With my best wishes.
Your Albert Einstein.

আইনস্টাইনের এই চিঠিতেও বেদান্তর বক্তব্য আভাসিত হয়েছে। আইনস্টাইন বারবার বলেছেন, তিনি স্পিনোজার সংজ্ঞায়িত ঈশ্বরকে মানেন। স্পিনোজার উপর এই বিশ্বাসই তাঁকে নিয়ে গেছে এক মহাজাগতিক ধর্মের দিকে। এই মহাজাগতিক ধর্মবোধই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছিল গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ উপস্থাপন করার পর তাঁর মনে হতে থাকল সমস্ত বলক্ষেত্রেই মহাকর্ষ তড়িৎ চুম্বকীয় (এর পরে বোধ্য নিউক্লিয়ার ক্ষীণ ও তীব্র বলক্ষেত্র) একটি একক মৌলিক বলক্ষেত্রেরই বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। তিনি এই একীকরণের চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর পর বলক্ষেত্রবাহী কণা ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল

বলেছেন— "About God I cannot accept any concept based on the authority of the Church. As long as I can remember I have rejected mass indoctrination I cannot prove to you there is no personal God but if I were to speak of him I would be a liar. I do not believe in the God of theology who rewards good and punish evils. His universe is not ruled by wishful thinking but by immutable laws"।

আইনস্টাইন আস্তিক না নাস্তিক— মহা বিভ্রান্তির ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল এক সময় যেমন আমাদের এখানে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে হয়। বিদ্যাসাগর পূজাঅর্চনাদি করতেন না। শ্রীহরিকেও না, অন্য কোনো দেবদেবীকেও না। শিক্ষার পাঠক্রমে শাস্ত্রাদির পাঠ পরিত্যাজ্য করেছিলেন। তিনি দৃশ্যত নাস্তিকই। কিন্তু চিঠিপত্রের শুরুটা করছেন শ্রীশ্রীহরি লিখে। টুলো পণ্ডিতদের সহ্য করতেন না। অথচ পিতা ঠাকুরদাসের শ্রাদ্ধাদি কার্যের সময় কাশীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পা ধুইয়ে

ক্ষমতাসম্পন্ন ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে একীকরণ তত্ত্ব আজ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে প্রায় সর্বাংশে। সেই এক ক্ষেত্র থেকেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উৎপত্তি— বেদান্তর সেই শ্লোক অবশ্যই মনে পড়ে—

'যতোবাইমানিভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়োন্তবি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্য তদ ব্রহ্মেতি।।

—যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি যা সব কিছুকে ধরে রেখেছে লালন পালন করেছে এবং যাতে সব কিছু লয় প্রাপ্ত হয় তুমি তাকে জানো, তিনিই ব্রহ্ম। আইনস্টাইন স্পিনোজা দর্শনের প্রভাবে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ওই 'এক' উপলব্ধির দিকে চালিত হয়েছেন।

১৯৩০ সালের গ্রীষ্মে আইনস্টাইন তাঁর অবকাশ যাপনের জন্য এক সুন্দর জায়গা পটাশডামের কাছে কাপুথ-এ একটি নিভৃত কুঞ্জে কাল-কাটানোর সময়ে হাভেল হ্রদে নৌকা বিহারের মধ্যে রচনা করেছিলেন তাঁর ধর্মমত CREDO— আমি যা বিশ্বাস করি, আইনস্টাইন এতে লিখেছিলেন— চিরন্তন অনন্ত রহস্যময় বিশ্বের কিছু রহস্য উন্মোচনে যে আমি প্রবৃত্ত হয়েছি এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। মহাবিশ্বের অতি চমৎকার গঠনশৈলী যা আমাদের কাছে খুব আশ্চর্যভাবে প্রতিভাত তার এক ভগ্নাংশকেও যে আমি বোঝার চেষ্টা করতে পেরেছি তাতেই আমি কৃতার্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি এক বৃটিশ সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন—

প্রকৃতির নিয়মের নানা বৈচিত্র্যকে এক সুরে বাঁধব— এই ছিল আমার জীবনের সব থেকে বড় উচ্চাশা। আমার কাজের উদ্দেশ্য হল মহাকর্ষ এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে আরও সরলভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের এক সূত্রে বেঁধে ফেলা। এজন্য আমি বিষয়টিকে বলি 'একক ক্ষেত্রতত্ত্ব'। এখন, কেবলমাত্র এখনই জানি, পরমাণু কেন্দ্রকের চারপাশে যে শক্তি ইলেকট্রনগুলিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরায় সেই একই শক্তিবলে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে তার বার্ষিক গতিতে ঘুরতে থাকে— His life Universe।

জড় জগতের প্রকৃতিকে প্রকাশ তিনি কেমনভাবে করেছেন ধর্মকে বিচার্য করে তা আগেই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলতেন— 'কোনো ব্যক্তি যদি জীবনের মহত্তর অর্থ খুঁজে পেতে চায় তাহলে তাকে ধর্মপরায়ণ বা আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন হতে হবে।' বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র আইনস্টাইনই প্রায়শই 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ধর্মচেতনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আইনস্টাইনের কাছে মনবুদ্ধির অতীত মহাবিশ্বের এই ঐক্যতান ছিল ঈশ্বরেরই সমার্থক। এই ঈশ্বর লৌকিক ঈশ্বর ছিল না বলে তিনি 'নাস্তিক' বলে বিবেচিত হতেন। অথচ প্রাকৃতিক ঐক্যবিধানকারী আইনস্টাইনের এই ঈশ্বর সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ যাঁর সর্বব্যাপ্ত ক্ষমতা সমগ্র মহাবিশ্বে বিস্তৃত এক মহাজাগতিক চালিকাশক্তিরূপে স্পিনোজা দর্শনই তাঁকে মহাজাগতিক ধর্মের দিকে চালিত করেছিল। তিনি ব্যক্ত করেছেন, 'আমি মনে করি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে সব থেকে প্রবল এবং মহৎ চালিকাশক্তি হল মহাজাগতিক ধর্মবোধ। সব যুগে এমনই এক ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটছে যার মধ্যে কোনো বদ্ধমূল ধারণার গোঁড়ামি নেই, নেই মানুষের প্রতিমূর্তিতে স্পষ্ট কোনো ঈশ্বরের উপস্থিতি। আমার মতে শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায় আগ্রহীর হৃদয়ে এই ধারণা সঞ্চিত করা। .... বিজ্ঞানে কোনো কিছু সৃষ্টি তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা প্রকৃত সত্যকে চিনতে এবং বুঝে নিতে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। এ জাতীয় অনুভূতির উৎস হল গভীর ধর্মবোধ।'

ঠিক এই সুরটি আইনস্টাইনের পূর্বসুরী আমাদের দেশের এক অতিবিশিষ্ট বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল। ১০ মে, ১৯০১ সাল রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে তাঁর বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র বলেন, 'আপাত বৈচিত্রের মধ্যে নিহিত ঐক্যের একটা স্পষ্টতর উপলব্ধির দিকে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। ... সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক বিশ্বব্যাপী ঐক্য রয়েছে, তা যখন দেখলাম আলোর তরঙ্গে যে ধূলিকণা নৃত্য করে, আমাদের পৃথিবীর বুকে যে জীবন স্পন্দিত হয় এবং যে উজ্জ্বল সূর্য আমাদের কিরণ দেয়, সব কিছুর মধ্যেই সেই ঐক্য অনুভব করলাম, তখন তিন হাজার বছর আগে গঙ্গার তীরে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে বাণী ঘোষণা করেছিলেন তার সামান্য অংশ সেই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম— এই বিশ্বের পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে যারা কেবল এক-কে দেখতে পায়, একমাত্র তারাই অনন্ত সত্যকে লাভ করে আর কেউ নয়।' আইনস্টাইন বলেছেন, 'বাস্তবজ্ঞান নিঃসন্দেহে আমাদের হাতে কিছু শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দেয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের শেষ কোথায় তার সংবাদ এবং সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা কি বাস্তবজ্ঞান আমাদের জোগাতে পারে?' এক্ষেত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে আইনস্টাইন বলেছেন, 'না, সেই জ্ঞানকে আসতে হবে আর একটি উৎস থেকে আর সেই উৎস হল ধর্ম। এই রকম একটা লক্ষ্য স্থির করে আর তার অনুরূপ মূল্যায়ন করেই কেবল আমাদের অস্তিত্ব আর ক্রিয়াকলাপের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ধর্মই মহাজাগতিক ধর্ম।'

আবার আশ্চর্যজনকভাবে বিবেকানন্দ এই মহাজাগতিক ধর্ম অনুশীলনের পথেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কৃত্রিম বিরোধের অবসানের কথা বলেছেন আইনস্টাইনের মতোই— 'বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে করমর্দন করবে। কবিতা ও দর্শন হবে পরস্পরের বন্ধু, ভবিষ্যতের ধর্ম এটাই।'

আবার অনুভূত এই মহাজাগতিক ধর্মের জন্যই রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া / বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।'

কিন্তু কেন আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একই মহাজাগতিক ধর্মের সুর?

তার কারণ আইনস্টাইন স্পিনোজার দর্শন প্রভাবিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ ব্যক্তি ধূসর অতীতে ভারতে রচিত 'বেদান্ত'র কথাগুলিই স্পিনোজার রচনাবলীতে পেয়েছেন। বেদান্তে অনির্দেশ্যবাদের স্থান নেই চূড়ান্ত অনুধাবনে। স্পিনোজাও বারবার বলেছেন, নির্দেশ্যবাদের কথা, ঠিক এজন্যই আইনস্টাইনের বিখ্যাত উক্তি God does not play Dice— ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে একসময় আইনস্টাইন তাঁর প্রস্তাবিত মহাজাগতিক ধ্রুবক ধারণা থেকে সরে এলেও জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী জন ব্যারো এবং এফ এম টিপলার প্রকাশিত 'নৃতত্ত্বীয় মহাজাগতিক নীতি'-র অনুসঙ্গ হিসেবে ওই মহাজাগতিক ধ্রুবক-এর প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। জোরদার হয়েছে এবং হচ্ছে 'বেদান্ত'র বক্তব্য তথা স্পিনোজার দর্শন। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান সংস্কৃতবিদ Theodore Gold Stucker-র ভাষায়—

"Spinoza's thought was.... a western system of philosophy which occupies a foremost rank among the philosophies of all nations and ages, and which is so exact a representation of the ideas of Vedanta, that we might have suspected its founder to have borrowed the fundamental principles of his system from the Hindus, did his biography not satisfy us that he was wholly unacquainted with their doctrines... We mean the philosophy of Spinoza, a man whose very life is a picture of that moral purity and intellectual indifference to the transitory charms of this world. Which is the constant longing of the true Vedanta philosopher... comparing the fundamental idea of both we should have no diffculty in proving that, had Spinoza been a Hindu, His system would in all pabebility mark a last phase of the Vedanta philosophy. [Litcrary remains & the late professor Thedore Gold Studorer, W. H. Allen 1879 p. 32, The West Minister Review, Vol. 78-79, Baldwin, Cradock onejay 1862 P. 1862]।

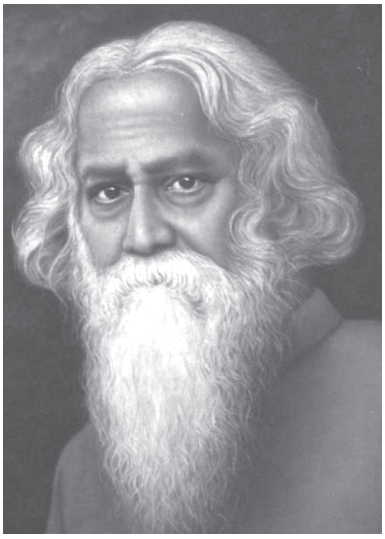

রবীন্দ্রনাথ

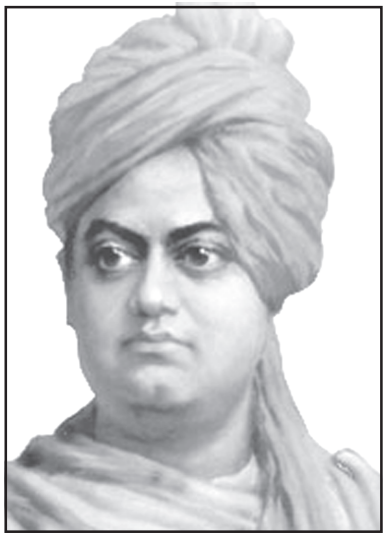

বিবেকানন্দ

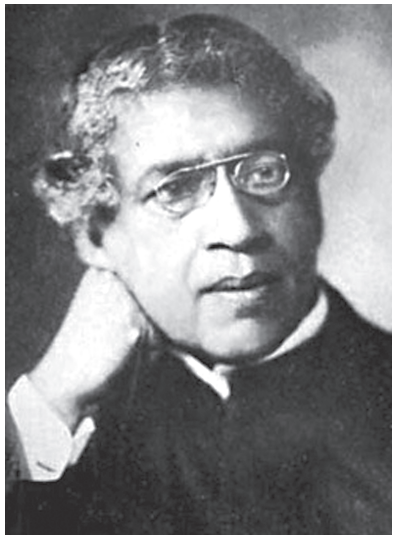

জগদীশচন্দ্র

ম্যাক্সমূলারও তাঁর বক্তৃতাগুলিতে স্পিনোজা— চিন্তা ও বেদান্তের মধ্যে প্রকটিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছিলেন,— "The Brahman as concealed in the Upanishads

and defined by Sankara is clearly the same as Spinoza's Substantia" [Kesinger Publishing 2003, Three Lectures on Vedanta Philosoply, F.Maxmuller]।

হেলেনা ব্লাভটস্কি, থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এক প্রবন্ধে বলেছেন, "As to Spinoza's deity natura naturans - conceived in his attributes simply and alone and the same deity as natura naturata or as Conceived in the endless series of modifications or corrections, the direct out flowing results from the properties of these attributes, it is the Vedanta Deity pure and simple [H. P. Blavatsky's Collected writtings vol.13, Quest Books]।

ইহুদি সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন স্পিনোজা। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে সোপেনওয়ার বলেছেন, গঙ্গা তীরে বাস করার সুযোগ থাকলে অনেক সম্মানের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারতেন স্পিনোজা। জানি না কেউ কি প্রবৃত্ত হবে স্পিনোজা - বেদান্ত উপস্থাপন নিয়ে গবেষণা করার, এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে! এর প্রয়োজন কিন্তু অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র ঃ

Subtle is the Lord - Abraham Faiz, Oxford। ইন্টারনেট তথ্য। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর মানবিক সত্তা — স্বামী তথাগতানন্দ, আনন্দ। বিজ্ঞানী অথচ অধ্যাত্মবাদী - স্বামী বুধানন্দ, উদ্বোধন। 'Man and his Univers' - John Langson Devis. 'Out of my letter years' - A. Einstein. Phil. Library, New York, 1950.

With Best Compliments from -

A
Well
Wisher

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে

উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তি আন্দোলনের এক বিস্ময়কর কাহিনী

ড. তুষার কান্তি ঘোষ

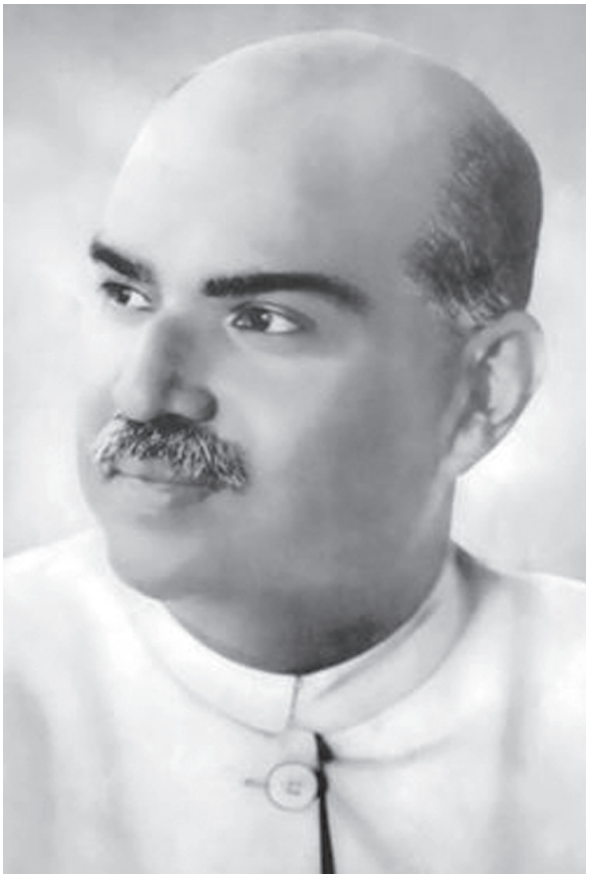

শ্যামাপ্রসাদ

১৯৩৯ সাল। মালদহ শহরের গঙ্গাবাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক অধিবেশন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-সহ বহু নেতা এসেছেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ জনসাধারণকে বললেন, 'দু-বছর পর আসছে লোক গণনার কার্যক্রম। এই লোকগণনাকে আপনারা সাধারণভাবে গ্রহণ করবেন না। এই লোকগণনা ভারতের সঙ্গে বাংলারও ভাগ্য নির্ধারণ করবে, মালদহ জেলার তো বটেই। মুসলমান ঘনবসতি জেলাগুলোতে হিন্দুদের খুবই তৎপর হতে হবে।' শ্যামাপ্রসাদ আরও বললেন, 'যেন সকল হিন্দু কোনোরূপ বর্ণের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হিন্দু বলেই জনগণনায় অংশগ্রহণ করেন।'

৩৮ বছরের প্রাজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন, ১৯৪১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুসারেই ভারতভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শ্যামাপ্রসাদ যখন এই কথাগুলো বলছেন, তখন বাংলায় চলছে মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের শাসন। ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে চেয়েছিলেন, ব্যর্থ হয়ে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট বাঁধলেন। এই মন্ত্রীসভা চলেছিল ১৯৩৭-১৯৪১ অবধি। তাঁদের শাসনকালেই জনগণনার কাজ হলো বাংলাদেশে।

জনগণনার সময় বেশ উত্তেজনা ছিল। বিভেদজর্জর বাংলায় এই জনগণনা বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। বাংলার পরিবেশ তখন মুসলিম লীগের দাপটে কম্পিত। মুসলিম লীগের সংগঠন ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেল। বীরভূমের মতো হিন্দুপ্রধান জেলাতে ১৯৩৯ সালে তাদের সদস্য ছিল ৫০০, ১৯৪১ সালে এসে সেটা দাঁড়াল ২৫০০০-এ। মালদহে বৃদ্ধি পেল ২৯০০০ থেকে ৪৩০০০-এ। পাবনা, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি থেকে ময়মনসিংহ সর্বত্রই লীগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

লীগ-হকের শাসনে বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর আক্রমণ চালানো হলো। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে 'শ্রীপদ্ম' থাকায় মুসলিম লীগ তা বানচালে সরব হলো। এমনকী রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাববস্তু না বুঝেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাতিলের জন্য উঠেপড়ে লাগলো লীগের সদস্যরা।

বিধানসভায় তখন নিত্য গণ্ডগোল। বাগেরহাটের বিধায়ক মুস্তাগওয়াল বিধানসভা কাঁপিয়ে বললেন, "We, who constitute Muslim Bengal, will not to Isate any poem which definitly shocks Muslim sentiment and which out rages Muslims feelings.'।

তদানীন্তন রাজনীতির ভাষ্যকার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা লিখলেন, লীগ শাসনে বাংলা কার্যত পাকিস্তান। ওই শাসনে বাংলায় পাকিস্তানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হলো—

যেসব জেলায় মুসলমান শতকরা ৫০ ভাগের উপর সেগুলো হলো— নদীয়া - ৬১.৬৭, মুর্শিদাবাদ - ৫৫.৫৬, যশোহর - ৬১.১৬, রাজশাহী - ৭৫.৭৯, রংপুর -৭০.৭৯, বগুড়া - ৮৩.৩৬, পাবনা - ৭৬.৯০, মালদহ - ৫৪.২৮, ঢাকা - ৬৬.৮১, ময়মনসিংহ - ৭৬.৫৬, ফরিদপুর - ৬৩.৮০, বাকরগঞ্জ-বরিশাল - ৭১.৬৩, ত্রিপুরা - ৭৫.৭৮, নোয়াখালি - ৭৮.৪৬, চট্টগ্রাম - ৭৩.৮০, দিনাজপুর - ৫০.৫৭।

যেসব জেলায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের কম সেগুলো হলো— বর্ধমান - ১৮.৫৬, বীরভূম ২৬.৬৯, বাঁকুড়া - ৪.৫৯, মেদিনীপুর - ৭.৫৯, হুগলি - ১৬.১৭, হাওড়া - ২১.২৭, ২৪ পরগনা - ৩৩.৬৫, কলকাতা - ২৬.০০, খুলনা - ৪৯.৫০, জলপাইগুড়ি - ২৩.৯৯, দার্জিলিং - ২.৬৩

হাওড়া শহর, কলকাতার উপকণ্ঠ ও ঢাকা শহরের জনগণনার রিপোর্ট সম্পূর্ণ হয়নি বলে প্রকাশিত হলো না। ১৯৩১ সালে হাওড়ায় মুসলমান ছিল ২১.১, কলকাতার উপকণ্ঠে ১৯.০০ আর ঢাকা শহরে ছিল ৪১.৩ শতাংশ। ঢাকা শহরে হিন্দুর প্রাধান্য ছিল।

লীগ-হকের প্রত্যক্ষ শাসনে জনগণনা হয়েছিল ১৯৪১ সালে। তবুও এই রিপোর্ট মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করেনি। সোহরাবর্দি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন জনগণনা সম্পর্কে। তিনি বললেন, '১৯৪১ সালের সেন্সাসে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই জনগণনায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশি করে দেখানো হয়েছে।' সোহরাবর্দি এমনও মন্তব্য করলেন যে সমগ্র বাংলাদেশে এমন একটি থানাও খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে হিন্দু ও তপশিলি মিলিয়েও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।'

জনগণনার এই রিপোর্টে মুসলিম লীগের আশাভঙ্গ হওয়ার কারণ ছিল। পাকিস্তান যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হবে এই বিশ্বাস তাদের অন্তরে ছিল। জিন্না নিজেও এক আমেরিকান সাংবাদিককে বলেছিলেন, মুসলমান অধ্যুষিত গরিষ্ঠ অঞ্চলে তিনি পাকিস্তান গঠন করবেন। স্বাভাবিক ভাবে হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চল ভারতে যাবে। বাংলার ক্ষেত্রেও যে হিন্দু -মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে বিভাজন হবে সেটা তারা স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন।

জনগণনার পর্যালোচনায় শ্যামাপ্রসাদ বিবৃতি দিলেন— 'সেন্সাসে তিনটি বিভিন্ন দফায় হিসাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তপশিলি জাতি; দ্বিতীয়ত, হিন্দু তবে কোন বর্ণভুক্ত তা বলা হয়নি; তৃতীয়ত, অন্য সকলে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অন্য কোনো প্রদেশেই হিন্দুদের এইরূপ পৃথক পৃথক জাতির নামে আলাদা করে রেকর্ড করা হয়নি। শুমারির সময় আমরা আন্দোলন চালিয়েছিলাম যে হিন্দুরা যেন সকলেই সেন্সাসে হিন্দু বলে আবেদন করেন। নিজেদের স্বতন্ত্র বর্ণের কথা উল্লেখ না করেন। রিপোর্টে মুসলমানদের মধ্যে বর্ণভেদ বা শ্রেণীভেদগত কোনো পৃথক জাতির উল্লেখ করা হয়নি।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সমগ্র হিন্দুদের মধ্যে একাত্মতার ভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সাফল্যমন্ডিত হয়নি। কারণ তাদের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রচারকার্যও অবিরাম চলছিল। এছাড়া তপশিলিদের মনেও ধারণা জন্মেছিল যে তারা নিজেদের জাতি স্পষ্ট করে না লিখলে তার ফলে হয়ত তারা তাদের প্রাপ্ত অধিকার সমূহ হতে বঞ্চিত হবেন। আমাদের এই আন্দোলনে বাংলার সকল জেলাতেই ভাল সাড়া পেয়েছিলাম। ওই সময় আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে, এমনকী কলকাতা হতে কবি নিজেও ওই আদমশুমারিতে নিজেকে হিন্দু বলে লিখেছিলেন।'

১৯৪১ সালের জনগণনা যে ভারতকে ভাগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে একথা জাতীয় স্তরের সকল নেতা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস যে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টকে ঘিরেই শেষে আবর্তিত হবে ভারতের ভাগ্যে তদানীন্তন জাতীয় নেতাদের এই সম্যক ধারণাই গড়ে ওঠেনি। কিন্তু সেদিন মুসলমান সমাজের কাছে এই জনগণনা জীবন-মরণ সমস্যার মতো ছিল। ভারতের রাজনীতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাববাদী চেতনার চেয়ে বাস্তববাদী জনসংখ্যার স্বরূপ যে বেশি প্রভাবশালী একথা মুসলমান নেতৃবৃন্দ খুব সহজেই বুঝে গিয়েছিলেন।

১৯৪১ সালের জনগণনা যে বাংলায় লীগ-হক প্রশাসনের প্রবল প্রাধান্যে প্রভাবান্বিত হয়েছিল এই কথা বহুজনই বুঝতে পেরেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে

বলেছিলেন, 'বাংলার জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের লোকেদের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য যদি পুনরায় লোকগণনা করা হয়, তাহলে হিন্দুরাই তাতে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবে। গত লোক গণনায় (১৯৪১) মুসলিম লীগের প্ররোচনায় গভর্নমেন্ট অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল বলে হিন্দুরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ যদি বাংলায় ঠিকমতো লোকগণনার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে হয়ত দেখা যাবে এই প্রদেশে হিন্দুরা আদৌ সংখ্যালঘু নয়।'

১৯৪১ সালের জনগণনার প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যাবে, কেন এই আদমশুমারি নিয়ে এত বিতর্ক। ১৯৩১ সালের জনগণনার রিপোর্টে ভিন্ন চিত্র ছিল। ১৯৩১ সালে সমস্ত বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ৪৭.২৪। ১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪.৪৮-এ। অর্থাৎ লোকগণনার সময় প্রতি জেলাতে ০.২২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দেখালেই বাংলাদেশে যে মুসলমান গরিষ্ঠতা চলে আসবে এবং তাদের কার্যে সিদ্ধিলাভ ঘটবে— এই সহজ সত্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ জানতেন।

মুসলিম লীগ ২৪ মার্চ, ১৯৪০ সালে তাদের লাহোর অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তার এক স্থানে বলা হয়েছিল— "... no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle viz. that geographically contiquous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial re-adjustment as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the north-western and eastern zone of India, should be grouped to constitute independent states in which the constitutents units shall be autonomous and sovereign"। পূর্ব ভারতে তাই বাংলা প্রদেশকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ না করলে সেই স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাবে মুসলিম লীগের নেতারা এই সত্যকে জানতেন। সেইজন্যই আদমশুমারির সময় তারা সচেষ্ট হয়েছিলেন।

লীগ-হক শাসনে বাংলায় মুসলিমদের মাথাপিছু যত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং যত প্রকল্প ঘোষিত হয়েছিল তাতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। ফলে ১৯৪১ সালের আদমশুমারি ছিল লীগ-হকের

সোহরাবর্দি

প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের ফসল। জনগণনায় নিযুক্ত ছিল লীগ-হক প্রশাসনের দ্বারা পছন্দ করা কর্মীবৃন্দ। তাদের শাসনকালে প্রশাসনিক নেতারা মুসলমানদের বোঝাতে পেরেছিলেন বাংলায় মুসলমান সংখ্যা ব্যাপকহারে না বাড়ালে মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা থাকবে না। তাই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা চাই। ১৯৪১ সালে তারা সেই প্রচেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণীয় যে বৃটিশ সরকার ১৯৪৮-এ ভারতকে স্বাধীন করার প্রস্তাব রেখেছিল। লীগ জানত এই সময়েই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী সোহরাবর্দি ১৯৪১ সালের সেন্সাসে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি কি ১৯৪৮ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে নতুন করে সেন্সাসের কথা ভেবেছিলেন? ১৩৫৪ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকা একটি রিপোর্ট প্রদান করে, তাতে তারা লিখেছেন, 'ভবিষ্যৎ বাংলায় সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডল থাকিতে পারিবে না বলিয়া সুরাবর্দিসাহেব আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু এখনই যে কেন সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডল থাকিতে দেওয়া হইবে না তাহা বলেন নাই। যে গ্রামবাংলার ছবি তিনি আঁকিয়াছেন সেই বাংলার সেন্সাস মি. সুরাবর্দির হাতে থাকিবে। তাঁহার সত্যনিষ্ঠার যে পরিচয় আমাদের জানা আছে তাহাতে ১৯৪৮

সালের ডিসেম্বর মাসে নতুন সেন্সাস লইয়া বাংলার হিন্দুর সংখ্যা শতকরা বিশজন ইহা দেখাইলেও আমরা বিস্মিত হইব না।'

লীগ সদস্যরা ১৯৪১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করল। কারণ ওই দিনটিতেই ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এর ফলে বাংলা জুড়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তীব্র হলো। মালদহ জেলাতেও লীগ ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় পালন করল পাকিস্তান দিবস। লীগ-হক শাসনকালে ফজলুল হক মুসলিম লীগের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন, তাতে বাংলায় লীগের সংগঠনের গণভিত্তি দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় লীগ একক বৃহৎ দলে পরিণত হয়ে গেল। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলায় লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করল।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর বাংলার অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ বলল, "The General Election is the begining of our struggle - we shall direct our attention towards British imperialism and demand immediate transferance of Pakistan"। ফিরোজ খাঁ নুন বললেন, 'যদি বৃটিশ গভর্নমেন্ট হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করেন তবে মুসলমানরা যা করবে তাতে চিঙ্গিস খাঁর কীর্তি ম্লান হয়ে যাবে (the destructions and havoc that the Muslim will do in this country will put into shade what Chengis Khan did")।

এই সব উত্তেজক ভাষণ বাংলা-সহ ভারতের বহু স্থানে দাঙ্গার সৃষ্টি করল। এইসময় মালদহে হিন্দুদের সংগঠন দানা বাঁধতে লাগল। ১৯৪১ সালে বেনারস থেকে রেশমের ব্যবসা দেখার জন্য চলে এলেন মুরলীধর নায়েক। তিনি অনুভব করলেন হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংগঠন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি এই সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা খুললেন মালদহে। সংগঠনের কাজ দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করছিল। সেই সময় পাকিস্তানের রণধ্বনি মালদহের গ্রামে গ্রামে দামামার মতো বেজে উঠতে শুরু করেছে। ১৯৪৫ সালে খালকেজী নামে এক প্রচারক সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য মালদহে চলে এলেন। ১৯৪৬ সালে এলেন জেলা প্রচারক রূপে বসন্তরাও খাড়গে। চাপাই নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাটে সঙ্ঘের কাজের বিস্তার করতে চলে এলেন সুকুমার ব্যানার্জী। হিন্দুদের মধ্যে সঙ্ঘের কাজের ব্যাপক বিস্তার লাভ করল।

পাকিস্তানের দাবি ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। লীগের সদস্যদের মুখে শোনা যেতে লাগল, 'লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান, হসকে লেঙ্গে পাকিস্তান'। ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-কে কেন্দ্র করে কলকাতা-সহ সারা দেশে শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশকে স্বাধীন করার সব আলোচনাতেই 'Dead Lock'-এর সৃষ্টি হলো। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন। তিনি যখন ভারতে আসছেন তার পূর্বে তিনি চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেন। চার্চিল তাঁকে বলেন, "...you must see that you don't harm a hair on the head of a single Muslim"। মাউন্টব্যাটেন উত্তর দিলেন, "The Muslims are very largely my companions of course I won't"।

বৃটিশদের ঘোষণানুযায়ী লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করার জন্য হাতে এক বছর তিন মাস আট দিন সময় পেয়েছিলেন। কারণ বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার করেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন আলোচনা শুরু করলেন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে। ভাবতে অবাক লাগে, যাঁরা বলেছিলেন কংগ্রেস ভারতবর্ষ বিভাজন করলে সেই ভাগের রেখা আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে যাবে ("If Congress wishes to accept partitions it would be over my deadbody" -- Gandhi-31.3.1947) কিংবা বলেছিলেন, "The idea of the formation of Pakistan is a fantastic nonsense" -- Nehru 5.4.1947। কী এমন ঘটল যে তাঁরা সকলে দেশভাগের প্রস্তাব সমর্থন করে নিলেন? ১৯৪৭ সালের ৩ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মাউন্টব্যাটেনের ভারত ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলো। নেহরু, প্যাটেল, মৌলানা, গান্ধীজী, পট্টভি সীতারামাইয়া, কৃপালনী, জয়রাম দাস, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সকলেই ছিলেন। শুধু বিরোধিতা করেছিলেন সীমান্তগান্ধী আবদুল গফফর খান। কৃপালনী বললেন, কোনো আলোচনা ছাড়াই ভারত ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সমগ্র দেশে এক হিমশীতল আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ল।

মালদহের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা বিনয় কুমার সরকার এর অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীনতার পূর্বে দেশ ভাগ হচ্ছে। তিনি তাঁর কলকাতার পরিমণ্ডলের সবাইকে নিযুক্ত করলেন পাকিস্তান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। বিনয়

সরকারের মুখে সেদিন বাংলা ভাগ বড় অদ্ভুত শুনিয়েছিল। যিনি ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মুখে বাংলা ভাগ বড় বিস্ময়ের ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, গান্ধীজী ভারত ভাগ করতে চলেছেন। গান্ধীজীর বৈবাহিক রাজা গোপালাচারী পঞ্জাব ও বাংলা-সহ ভারত ভাগের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে ছিল গান্ধীজীর প্রস্তাব। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বিনয় সরকারের আত্মিক যোগাযোগ ছিল।

তাই বাংলার কয়েকজন মনীষী অনুভব করলেন, ভারত ভাগের শেষ অস্ত্র রূপে মাউন্টব্যাটেন যে জিনিস ব্যবহার করবেন তা হলো ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট।

১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে (৪৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা) 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'বাংলার জনসংখ্যার মানচিত্র' শীর্ষকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যক্ষ ড. চট্টোপাধ্যায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন এবং সার্ভে অব ইন্ডিয়া কর্তৃক মানচিত্রটি মুদ্রিত হয়। এতে দেখা যায় যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলো ভাগ করলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশালের কতগুলো এবং খুলনা, কলকাতাসহ চব্বিশ পরগনা ও বর্ধমান বিভাগ নিয়ে একটি হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশ অনায়াসেই গঠিত হতে পারে। ১৯৩১ সালের জনগণনার রিপোর্ট দিয়ে ড. চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কীভাবে মালদহ, মুর্শিদাবাদ-সহ বেশ কিছু জেলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং বিভিন্ন জেলায় হিন্দুগরিষ্ঠ থানাগুলোকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা বা অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'শাসনকার্যের জন্য এইপ্রকার খামখেয়ালি সীমা পরিবর্তন ভূগোল-বিজ্ঞান সমর্থন করে না।'

জাতীয় স্তরের এইরূপ সমস্যায় ১৯৪৭ সালের ৪-৬ এপ্রিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় শ্যামাপ্রসাদ বললেন, "I conceive no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let their two main communities residing here in live in peace and freedom"। নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, পাকিস্তানের দাবিতে মুসলমানরা যেমন সোচ্চার তেমনই হিন্দুদের পৃথক বাংলা গঠন ছাড়া পথ নেই।

শ্যামাপ্রসাদ এইভাবে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে

মাউন্টব্যাটেন

র‍্যাডক্লিফ

আলাদা রাজ্য গঠনের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হলেন। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার তাঁর পাক্ষিক প্রতিবেদনে জানালেন, "This movement was gradually gaining strength in all the districts of the division and local Congress organisation became active in support of the momement"।

যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম জেলার হিন্দুরা এই আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করল।

বাংলায় মুসলিম লীগের শাসনাধীনে নগ্ন সাম্প্রদায়িক প্রচার লীগের প্রধান কার্যে পরিণত হয়েছিল। ফলে এই দশ বছরে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা, অক্ষমতা এবং মিথ্যাচারের বিষ এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে শাসন ব্যবস্থার উপর থেকে সকলের আস্থা চলে গিয়েছিল। তাছাড়া নাজিমুদ্দিন সোহরাবর্দি, মৌলানা আকরম খাঁ রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কাছে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন, 'তারা মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। মুসলমান সমাজকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন, আপনারা সকলে মুসলিম লীগের সদস্য হোন। লীগকে থানায় থানায় গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডে সমস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করুন।' ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক এদের দলের উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তা ছিলেন। উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে তার ভাষা ছিল খুবই উত্তেজক। তার বক্তব্য, 'তারা (দেশভাগের প্রতিরোধকারী হিন্দু নেতারা) ভারতবর্ষ থেকে মোসলমানদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে চায়। মোসলেম লীগ আপনাদের রক্ষার জন্য এসেছে, তাই লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন। আর মনে রাখবেন মহম্মদ মৌলানা আলির কথা— "When Islam calls I am Moslem first, Moslem second and Moslem third, nothing but a Moslem"। লীগের এই গণসংযোগ বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে volcanic fire-এ পরিণত করল।

যদি বাংলা পাকিস্তানে যায় তাহলে এই প্রদেশের যে অংশ হিন্দুপ্রধান সেই অংশকে নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠন করে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করার এক আন্দোলন চলতে লাগল এই পরিস্থিতিতে।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, 'বাংলা ও পঞ্জাবের প্রাদেশিক আইন পরিষদকে (ইউরোপীয় সদস্যদের বাদ দিয়ে) দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে অধিবেশন করতে বলা হবে। এক অংশে থাকবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা, অন্য অংশে থাকবে প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধি। জেলার লোকসংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১৯৪১ সালের আদমশুমারিকেই (সেন্সাস রিপোর্ট) প্রামাণ্য বলে ধরা হবে।

১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলার মুসলমান প্রধান জেলাগুলো হলো— চট্টগ্রাম বিভাগ— চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা। ঢাকা বিভাগ— বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ। প্রেসিডেন্সি বিভাগ— যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া। রাজশাহী বিভাগ— বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর।

ভাগ করার জন্য সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠিত হলো। সভাপতি হলেন স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফ। সদস্য হলেন বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, আবু সালে মহম্মদ আক্রম এবং এস এ রহমান।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রাজশাহী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাকে বাঁচানোর জন্য শ্যামাপ্রসাদের নির্দেশে একটি বলিষ্ঠ ডেপুটেশন তৈরি করা হলো। তৈরি করলেন শিবেন্দু শেখর রায়। তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ছিলেন। এই ডেপুটেশনে বলা হলো, ভাইসরয় হিন্দু বেঙ্গল বলতে উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণে বর্ধমান বিভাগ, খুলনা ও ২৪ পরগনাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থিতি, যাতায়াত ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষার জন্য উত্তর ও দক্ষিণের দুটি ব্লককে নতুন জেলা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। তাতে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না।

এই কমিশনের কাছে আরও বলা হলো যে, ভাইসরয় বলেছেন যে অ-মুসলমান দ্বারা যদি কোনো একটি ক্ষেত্রে সংগঠিত ব্লক (compact Block) গঠিত হয় তবে সে ব্লককে ভারতে যোগ করা যেতে পারে। সেই দৃষ্টিতে মালদহের বহু মানুষ অ-মুসলমান (হিন্দু), এমনকী বংশীহারী, ইটাহার, গঙ্গারামপুর, দিনাজপুরের উত্তরের থানাগুলিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং ওই এলাকা ভারতে যুক্ত করতে হবে।

মালদহের জনসংখ্যার অনুপাত বিশ্লেষণ করে এলাকায় অ-মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখানো হলো (সারণি 'ক' ও 'খ' দ্রষ্টব্য)।

ডেপুটেশনে বলা হলো মালদহের উপরোক্ত ক্ষেত্রের অ-মুসলমান অধিবাসীদের শতকরা হার ৬৪.৪। সুতরাং এই এলাকা একটি compact Block বলে চিহ্নিত হোক।

মালদহের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার দিকে লক্ষ্য

করলে দেখা যাবে, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং খরবা ও নাচোলের কিছু এলাকা হিন্দুপ্রধান। এমনকী নবাবগঞ্জের ঝিলিম ইউনিয়নের এলাকাও হিন্দুপ্রধান। 'খ' সারণিতে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গোমস্তাপুর থানাতেও যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে চারটি ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২১৪০০-এর মতো। এর মধ্যে ১৬০৪০ জন অ-মুসলমান। ফলে গোমস্তাপুরকে একটা compact Block -এ চিহ্নিত করে মালদহে যুক্ত করে ভারতে নিয়ে আসতে হবে। নবাবগঞ্জের ঝিলিম ইউনিয়নে ভারতীয় রেলওয়ের বিখ্যাত স্টেশন অ্যামনুরা সংশ্লিষ্ট নাচোল এলাকার মধ্যে পড়ে। এই এলাকাকে যদি 'ক' সারণিভুক্ত করা যায় দেখা যাবে, ৭৫৬৯৫৭ জনের মধ্যে মুসলমান ৩,১১৯৭৭ এবং অ-মুসলমান ৪৪৪৯৮০ জন। সুতরাং এই এলাকাকে ভারতভুক্ত করতে হবে।

যদি 'ক' সারণিভুক্ত মালদহ এলাকার সঙ্গে অ-মুসলমান প্রধান দিনাজপুর এলাকা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তবে দেখা যাবে এই এলাকার ৭০ ভাগ লোকই হচ্ছে অ-মুসলমান এবং এই ব্লকটা গঠিত হবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ নিয়ে।

'খ' সারণিভুক্ত এলাকা মালদহের 'ক' এলাকার সঙ্গে যুক্ত করলে মালদহের জনসংখ্যায় অ-মুসলমানদের প্রাধান্য বাড়বে এবং সেটা হবে ৬৫ ভাগ। সুতরাং মালদহ জেলাকে হিন্দু বেঙ্গলে যুক্ত করতে হবে এবং মহানন্দা, কালিন্দী, টাঙ্গন, পুনর্ভবা নদীগুলো হবে এই জেলার যাতায়াতের মাধ্যম।

'ক' ও 'খ' সারণি এলাকায় উৎপন্ন হয় আম, লাক্ষা, রেশম, ধান, গম, পাট, রবিশস্য। গত বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) মালদহ জেলা উৎপাদনে উদ্বৃত্ত ছিল। সেনাবাহিনীর প্যারাস্যুট তৈরি করার জন্য অজস্র সিল্কের সুতো মালদহ সরবরাহ করেছিল। যে জেলার ঘোর গ্রামে রূপ সনাতন জন্মায়, যে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন আছে, যে গৌড় ও পুন্ড্র নবাবি হিন্দু রাজত্বের গৌরবজনক ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল, যে মালদহে অজস্র বৌদ্ধতীর্থ ও হিন্দুতীর্থ আছে সেই মালদহ কিছুতেই পাকিস্তানে যেতে পারে না। তাছাড়া শেরশা বাদিয়াদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখানোর চেষ্টা করছেন, মি. কার্টার (আই সি এস)-এর মতানুসারে তারা বাঙালি নয়, এসেছে অন্যত্র থেকে। এছাড়া মালদহে যেসব খোট্টা ভাষাভাষী লোক বাস করে সেই ভাষা মিথিলার হিন্দি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল, এই ভাষার সঙ্গে মালদহের নাড়ির টান আছে। সামরিক দিক দিয়ে ভারতকে

সারণি 'ক'

থানা	মুসলমান	অ-মুসলমান	মোট
গাজোল	২০৮০৭	৫২৫৮০	৭৩৩৮৭
বামনগোলা	১৫২৫৪	২০৭১৯	৩৫৯৭৬
হবিবপুর	৬৯০৯	৫৪৩৯৮	৫৮৩০৭
মালদহ	১১৭২২	২২২৫৬	৩৩৯৭৮
ইংলিশ বাজার	৩৭২৩৩	৪৬৩০৬	৮৩৫৩৯
মানিকচক	২১৬৪৭	৪৩১৪০	৬৪৭৮৭
মোট	১১৩৫৭২	২৩০৩৯৯	৩৪৩৯৭১

সারণি 'খ'

থানা	মুসলমান	অ-মুসলমান	মোট
রতুয়া	৫৮৬১০	৪৭৩৮৫	১০৫৯৯৫
হরিশ্চন্দ্রপুর	৫৬৬৯৬	৪৩২৮৮	৯৯৯২৪
খরবা	৬১৪৮	৯১৯১৪	৪৮০৬২
গোমস্তাপুর	৩৫৭৮৫	২৩২৪০	৫৯০২৫
নাচোল	৭১৫০	২৩২১৫	৩০৩৬৫
নবাবগঞ্জ ঝিলিম ইউনি.	১৩৬০	১৮৬৩	৩২২৩
মোট	১৬৫৭৪৯	১৮০৮৪৫	৩৪৬৫৯৪
কালিয়াচক ৭ ইউনিয়ন	৩৩৭৩৬	৬৬৩৯২	১০০৬২৮

শক্তিশালী করতে হলে রাজমহলের কসবী গলি যা সাঁওতাল পরগনা ও মালদহের মধ্যে অবস্থান করছে, তা ভারতভুক্ত করতে হবে। সুতরাং মালদহ সমেত দিনাজপুর এই কমপ্যাক্ট ব্লকের ভারতভুক্তি চাই।

সেদিনের সীমানা নির্ধারণে কমিশনের কাছে জোর সওয়াল করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী, স্যার যদুনাথ সরকার ও মালদহের শিবেন্দু শেখর রায়। মালদহ সমেত উত্তরবঙ্গের compact Block ভারতে যুক্ত করতে হবে— এই ডেপুটেশনে সই করেছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শিবেন্দুশেখর রায়, রামহরি রায় প্রমুখ। আর মালদহ পাকিস্তানে যাক এই বিষয়ে যেসব মুসলমান নেতা ডেপুটেশনে সই করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মহম্মদ সঈদ মিঞা,

জহুর আহম্মদ চৌধুরী, তুহু আহম্মদ চৌধুরী প্রমুখ।

সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন কাঁচি দিয়ে ভারতের মানচিত্র ভাগ করতে। সূত্র ছিল সেই বহুচর্চিত ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট। জনগণনার রিপোর্ট যে কীরূপ মুল্যবান হতে পারে তা বোঝা গিয়েছিল সীমানা নির্ধারণের কমিশনের সওয়ালে। এক এক গ্রাম, এক একটা ইউনিয়ন নিয়ে লড়াই চলেছিল। সে কী উত্তেজনা! মালদহ-সহ উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তির জন্য আন্দোলন করেছিলেন শিবেন্দুশেখর রায়, সিতাংশু কান্ত আচার্য চৌধুরী, রমেশচন্দ্র বাগচী, রমেশ ঘোষ, দেবেন ঝা, আশুতোষ চৌধুরী, যদুনন্দন চৌধুরী, অতুল কুমার, মতিলাল বিহানী, রামহরি রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, হরিপ্রসন্ন মিশ্র, মুরলীধর নায়েক, শুভনারায়ণ গিরি, নরেন চক্রবর্তী, নলিনী ভৌমিক, যামিনী কান্ত দে, সূর্যকান্ত দে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

আর মুসলিম লীগের নেতা জুহুর আহম্মদ চৌধুরী, তুহু আহম্মদ চৌধুরী, আনসার চৌধুরী, জিন্নত হুসেন প্রমুখ নেতা মালদহ জেলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন পাকিস্তান আদায়ের জন্য।

আরেকটি কথা, এই সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি যারা সমগ্র বাংলা মুসলিম অধ্যুষিত বলে পাকিস্তানের মধ্যে যাক এই দাবির সপক্ষে গিয়েছিলেন, তারাই আবার শ্যামাপ্রসাদের বাংলাভাগের যুক্তির কাছে বশীভূত, তারাও বাংলাভাগ চেয়েছিলেন— তাতে তাদের অভিমত ছিল মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াকে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হোক আর খুলনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক ভারতের সঙ্গে।

অনেক উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে ১৭ আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে র‍্যাড ক্লিফ কমিশনের রায় ঘোষণা হলো। তার একটি অংশ তুলে ধরা হলো—

"From that point the line shall run along the boundary between the following Thanas -

Balurghat and Panchbibi, Balurghat and Joypurhat, Balurghat and Dhamairhat, Tapan and Dhamairhat, Tapan and Patnitala, Tapan and Porsha, Bamangola and Porsha, Habibpur and Bholahat, English Bazar and Shibganj, Kaliachak and Shibganj to the point where boundary between the two last mentioned thanas meets the boundary between the Districts of Malda and Murshidabad"।

The line shall then turn south-east down the river Ganges along the boundary between the Districts of Malda and Murshidabad, Rajshahi and Murshidabad, Rajshahi and Nadia"।

মালদহের ও দিনাজপুরের এক অংশ চলে গেল পাকিস্তানে, মুর্শিদাবাদ আর নদীয়া এল ভারতে।

বহুদিন পার হয়ে গেছে। আজ এইসব কাহিনি ইতিহাস হয়ে গেছে। চোখে দেখা দেশবিভাগ আজ বহুজনের কাছেই অন্তরের বেদনাঘন অভিব্যক্তির চাপা আর্তনাদে পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম এই করুণ কাহিনির শ্রোতা নন, দর্শক তো ননই। ১৯৪১ সালের সেন্সাসের উপর কোনো উচ্চ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থার গবেষণা যদি ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবে সেদিনের প্রকৃত চিত্র দেশবাসীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হবেই। ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে একটি মানচিত্র, একটি কাঁচি, একটি লাল পেন্সিল, ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট ও সওয়ালের উপর ভিত্তি করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক বিচিত্র ঘটনা— এক রহস্যজনক ঘটনা। কোনো সক্রিয় গবেষক গোষ্ঠী এই রহস্যের উন্মোচন করবেন, একদিন না একদিন— এই বিশ্বাস আজও অনেকের আছে।

তথ্যপঞ্জী—

(১) প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩৫৪, ১ম সংখ্যা (৪৭শ ভাগ ১ম খণ্ড)। (২) প্রবাসী - জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪, ২য় সংখ্যা (৪৭শ ভাগ ১ম খণ্ড)। (৩) প্রবাসী - আষাঢ়, ১৩৫৪ ৩য় সংখ্যা (৪৭শ ভাগ ১ম খণ্ড)। (৪) বিভক্ত ভারত - বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, কলকাতা, ১৩৫৬। (৫) ফজলুল হক — জীবন ও রাজনীতি : সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, কলকাতা - ৭৩, ২০০১। (৬) পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য - গঙ্গাধর অধিকারী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৪৪। (৭) Mountbatten and the Partition of India - Collins & Lappierre, Gaziabad, 1983. (৮) The Partition of Bengal and Assam (1932-1947) Bidyut Chakraborty, London, 2004. (৯) Report of the Deputation placed before the Radcliffe Commissions on behalf of Malda People (Typed copy).

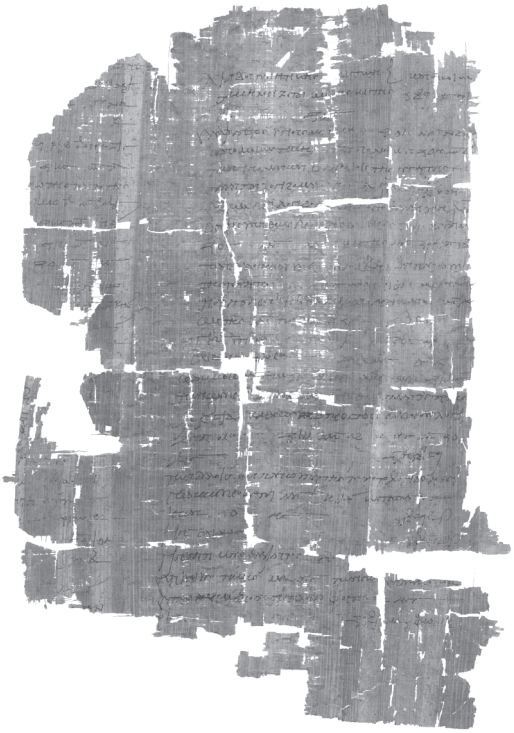

মুজিরিস প্যাপিরাস, উপরিভাগ
সৌজন্যে : অস্ট্রিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি

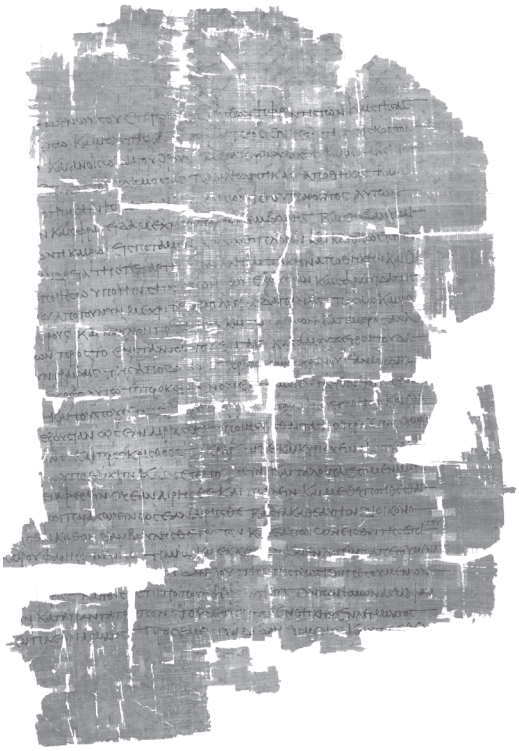

মুজিরিস প্যাপিরাস, পশ্চাদভাগ
সৌজন্যে : অস্ট্রিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি

ছিন্ন তমসুকের কাহিনি

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সাতটি মহাসাগরের মধ্যে একটি মাত্র মহাসাগরেরই নাম এক দেশের নামে নামাঙ্কিত। আমরা চিনি ভারত মহাসাগর নামে। এই মহাসাগরের মাধ্যমে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। অন্য কোনো দেশ এত ব্যাপকভাবে এই মহাসাগরকে সেই সময় ব্যবহার করতে পারেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই কালক্রমে এই মহাসাগরের নামের সঙ্গে ভারত যুক্ত হয়েছে।

এই মহাসাগরের কতকগুলি বিশেষত্ব অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ব্যবসায়ী, অভিযাত্রী এবং বৈজ্ঞানিকরা অবগত ছিলেন। আর তাদের সেই আবিষ্কারই ভারতীয়দের এই মহাসাগরের নিয়ন্ত্রকের আসনে বসিয়েছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা আবিষ্কার করেছিলেন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ। এই বায়ুপ্রবাহ ভারত মহাসাগরে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-অক্টোবর) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এবং শীতকালে (নভেম্বর থেকে মার্চ) উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। তাই অতি প্রাচীন কাল থেকে শীতকালে ভারতীয় বণিকরা এই বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সহজেই অন্যান্য দেশে পাড়ি জমাতেন। আর তারা দেশে ফিরতেন গ্রীষ্মকালে। পৃথিবীর বাকি ছয়টি মহাসাগরের কোথাও এই ধরনের নির্দিষ্ট বায়ুপ্রবাহ দেখা যায় না। ভারত মহাসাগর পৃথিবীর উষ্ণতম মহাসাগরও। যা এই মহাসাগরকে নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। বহু যুগ থেকে ভারতীয়দের একথা জানা ছিল। বহু পরে এই বিষয়গুলি জানতে পারে পাশ্চাত্য বণিকরা। তখন থেকেই তাদের এই মহাসাগরে আগমন বৃদ্ধি পায়।

সমুদ্রের এক ঢেউ অপর ঢেউকে মুছে দেয়। মুহূর্তমধ্যে অতীতের চিরকালীন সমাধি। জল দিয়ে জল-বিজয়ের কাহিনি লেখা তাই এককথায় অসম্ভব। তাই এর জন্য প্রয়োজন অন্য উপকরণের। ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অতীত মহাসাগরীয় সম্বন্ধের ইতিহাস খুঁজে বের করা এই কারণেই অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে সমকালীন লিখিত দলিল। ঐতিহাসিকেরা কিন্তু সহজে হতাশ হন না। তাদের

অনুসন্ধানও থেমে থাকে না। তাঁদের অনলস অনুসন্ধিৎসার ফসল দুটি ছিন্ন তমসুক। প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন দুটি প্যাপিরাসের ছেঁড়া পাতা। শতছিন্ন এই দুটি পাতা থেকেই ভারতের সঙ্গে প্রতীচ্য দুনিয়ার প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের আশ্চর্য কাহিনি উঠে এসেছে।

কায়রো শহরের ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশরের একটি প্রাচীন নগর অক্সিরিনকাস অবস্থিত। আলেকজান্ডারের মিশর জয়ের (৩৩২ বর্তমান পূর্বাব্দ) পরেই এই নগর একটি গ্রিক বসতিতে পরিণত হয়। ১৮৯৬ অব্দে বার্নার্ড গ্রেডফেল এবং আর্থার হান্ট প্রথম প্রাচীন অক্সিরিনকাস নগরীর উপকণ্ঠে কয়েকটি প্রাচীন জঞ্জালের ঢিবি উৎখননের কাজ শুরু করেন। ঐ ঢিবিগুলি ছিল দু'হাজার বছরেরও প্রাচীন। এক হাজার বছর ধরে অক্সিরিনকাসের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং বাড়ি থেকে বাতিল প্যাপিরাসের কাগজের পাণ্ডুলিপি শহরের বাইরে ফেলে আসা হতো। তারপর ওই শহর পুনর্গঠিত হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ওই স্থানে অদরকারী দলিল-দস্তাবেজ ফেলা বন্ধ হয়। আরও হাজার বছর মাটি-বালির স্তূপের নীচে ওই সকল পান্ডুলিপি চাপা পড়ে থাকে।

অক্সিরিনকাস উৎখননে উঠে আসা লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে দশ শতাংশ পাণ্ডুলিপি ছিল সাহিত্য বিষয়ক। বাকি সবই সরকারি বেসরকারি নথিপত্র। ঐ সকল সাহিত্য কর্মের ভিতর চ্যারিসন নামে একটি ছোট কৌতুক নাটিকা পাওয়া যায়। নাটিকার পাণ্ডুলিপিটি (P.oxy III) বর্তমানে অক্সফোর্ডর বোদেলিয়ান (Bodleian) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিকরা নাটিকাটিকে অ্যান্টোনাইন (Antonine) বংশের (১২৮-১৯৩ অব্দ) সমকালীন বলে নির্ণয় করেছেন। এই একাঙ্ক নাটকটি মূলত গ্রিক ভাষায় লেখা হলেও এতে একটি বিদেশী ভাষ্যও ব্যবহৃত হয়েছে। নাটিকাটি এথেন্সের প্রাচীন নাট্যকার ইউরিপিদেস (Euripides, আনু. ৪৮০-৪০৬ খৃস্ট পূর্বাব্দ) -এর লেখা নাটক আইফিজিনিয়া ইন টরিস (Iphigeneia in Tauris, ৪১৪ খৃস্ট পূর্বাব্দ এবং ৪১২ খৃস্ট পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত)-এর অনুকরণ। আলোচ্য নাটিকাটিতে গ্রীক মহাকাব্য ওডিসির (আনু. খৃস্ট পূর্বাব্দের অষ্টম শতক) প্রভাবও বিদ্যমান। সম্ভবত এই নাটিকাটি তৎকালীন মিশরে অভিনীত হতো।

এই নাটিকার পাণ্ডুলিপিতে কাহিনির নায়িকা চ্যারিসন এক সুন্দরী গ্রিক যুবতী। চ্যারিসন সম্ভবত মিশর থেকে কোনোভাবে ক্রীতদাসী হিসাবে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী মালপে নামক বন্দরে সেখানকার রাজার কাছে বিক্রিত হন। পণ্ডিতরা এই মালপে বন্দরটিকে বর্তমান কর্ণাটকের একটি সমুদ্র বন্দর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মালপের রাজা চ্যারিসনকে সম্ভবত দেবদাসী হিসাবেই স্থানীয় চন্দ্র মন্দিরে বন্দী করে রেখেছিলেন। চ্যারিসন নাটকের সমকালীন পেরিপ্লুস মরিস ইরিথ্রাই নামক গ্রিক নাবিকের লগবুকে আমরা এই ধরনের বংশীবাদিকা বিদেশিনী ক্রীতদাসীর কথা জানতে পারি।

চ্যারিসনকে খুঁজতে ইতিমধ্যে একটি উদ্ধারকারী দল ওই বন্দরে এসে পৌঁছয়। ওই দলে চ্যারিসনের ভাই, জাহাজের ক্যাপ্টেন, এমনকী এক বিদূষকও ছিল। এই দলটির সঙ্গে চ্যারিসনের দেখা হলে তারা এখান থেকে তাকে নিয়ে পালাবার পরিকল্পনা করে। নাটিকার কাহিনি অনুসারে ওই গ্রিক দল রাজা এবং তার সঙ্গীদের একদিন মদিরা পরিবেশন করে। (কাহিনি থেকে জানা যায় এসইসময় মদিরা সম্পর্কে ভারতীয়রা অজ্ঞাত ছিল, গ্রিক দল ভারতীয়দের সেই অজ্ঞতার সুযোগে তাদের ভুল বুঝিয়ে দ্রাক্ষা মদিরা পান করায়)। এরপর সকলে চন্দ্রমন্দিরে মদিরা পান করে নৃত্য করতে করতে অবসন্ন হয়ে পড়লে চ্যারিসনকে নিয়ে গ্রিকদের তাদের নৌকার সাহায্যে পলায়ন করে। পালাবার আগে গ্রিক বিদূষকটির চন্দ্রমন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠনের ইচ্ছা থাকলেও চ্যারিসন দেবীর অভিশাপের কথা বলে তাকে একাজ থেকে বিরত করে। পাণ্ডুলিপির আর পৃষ্ঠা খুঁজে না পাওয়ায় কাহিনি অসম্পূর্ণ।

চ্যারিসন পান্ডুলিপির প্রথম সম্পাদক ডি এল পেজের মত হল, চ্যারিসনকে মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্যই বন্দি করে রাখা হয়েছিল। পাণ্ডুলিপির কোনো স্থানে এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত না থাকায় এই তত্ত্বকে খারিজ করে ঐতিহাসিক এম এল ভরত পাণ্ডে বলেন, নাটিকাটিতে রাজার চ্যারিসনের প্রতি আগ্রহ দেখে মনে হয় সম্ভবত তাঁর চ্যারিসনকে বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল।

১৯২৬ সালে ড. শ্যাম শাস্ত্রী মাইসোর আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্টে নাটিকায় ব্যবহৃত বিদেশি ভাষাটিকে কন্নড় বলে চিহ্নিত করেন। ১৯৩৬ অব্দে কন্নড় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হাল্মিদি লেখমালা (৪৫০-৫০০ অব্দ) আবিষ্কৃত হলে ড. শাস্ত্রীর মতই মোটামুটি সকলে মেনে নেন। প্রাচীন কর্ণাটকের সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তার বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই। উদাহরণ স্বরূপ কর্ণাটক উপকূলীয় চন্দ্রাবলীতে রোমক শাসক অগাস্টাস সিজারের (৬৩ খৃঃ পূর্বাব্দ - ১৪ অব্দঃ) মুদ্রা পাওয়া গেছে। মালপে সমুদ্র বন্দরটিকে বর্তমান কর্ণাটকের উদিপি শহরের চার মাইল দূরবর্তী একটি প্রাকৃতিক বন্দরের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, উদিপি কথার অর্থ চন্দ্র। নাটিকায় উল্লেখিত পসলিকুস নদীটিকে ঐতিহাসিকরা উদিপির পাপনাশিনী নদী রূপে চিহ্নিত করেছে। উদিপির বর্তমান ওদাভাণ্ডেশ্বর (ওড-ভাণ্ড-ঈশ্বর বা নৌকা-জাহাজ-ঈশ্বর) বৈষ্ণব মন্দিরটি পণ্ডিতদের মতে প্রাচীনকালে একটি শিবমন্দির ছিল। অর্থাৎ এটি চন্দ্র দেবতার কথিত মন্দির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের জানা নেই, নাটিকাটির লেখক স্বয়ং মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন কিনা। জানা নেই তিনি মেগাস্থেনিসের (৩৫০ খৃঃ পূর্বাব্দ - ২৯০ খৃস্ট পূর্বাব্দ) লেখা থেকে বা তৎকালীন গ্রিক ভারতীয় বণিকদের থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কিনা। কেউ কেউ মনে করে থাকেন, গ্রিক বণিকদের সঙ্গে কখনো কখনো তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্য গোষ্ঠীও বিদেশ

সারণি - ১

সামগ্রী	দাম / একক	নির্দিষ্ট নির্ধারিত মূল্য
কচ্ছপের খোল	৪৮ দ্রাখমা প্রতি মিনা	২৪ টলেন্ট, ৩৮৮৮ দ্রাখমা
তেজপাতা	১২ দ্রাখমা প্রতি মিনা	২২৩ টলেন্ট, ৩৪২৯ দ্রাখমা
গোলমরিচ	৬ দ্রাখমা প্রতি মিনা	৭৭২ টলেন্ট, ৫৩৭৭.৫ দ্রাখমা
গাঙ্গেয় নালদ (আয়ুর্বেদিক ওষধি)	৪৫০০ দ্রাখমা প্রতি মিনা	৪৫ টলেন্ট
পূর্ণাঙ্গ হাতির দাঁত	১০০ দ্রাখমা প্রতি মিনা	৭৬ টলেন্ট, ৫২৭৫ দ্রাখমা
খণ্ডিত হাতির দাঁত (স্কিদাই)	৭০ দ্রাখমা প্রতি মিনা	৮ টলেন্ট, ৫৮৮২.৫ দ্রাখমা

যাত্রা করতো। এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। বর্তমান আলোচ্য নাটিকাটি কাল্পনিক হলেও দু'হাজার বছরের প্রাচীন এই রচনা নিশ্চিতভাবে ভারতের সঙ্গে তৎকালীন মিশর-গ্রিসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথাই পরিস্ফুট করে।

এবার আমরা যে প্যাপিরাস নিয়ে আলোচনা করবো তা দ্বিতীয় অব্দের একটি ঋণ-চুক্তিপত্র। এখানে দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূলে মুজিরিস বন্দর থেকে ভারতীয় সামগ্রীর মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছাবার কাহিনি দেখতে পাই। এই চুক্তিপত্রটিকে বর্তমানে মুজিরিস প্যাপিরাস বা ভিয়েনা প্যাপিরাস (যেহেতু বর্তমানে এই নথিটি ভিয়েনায় সংরক্ষিত আছে) নাম অভিহিত করা হচ্ছে। ১৯৮০ অব্দে মিশরের এক সংগ্রাহক এই প্যাপিরাসটি বিক্রি করলে প্রথম তা পণ্ডিতদের নজরে আসে। ১৯৮৫ অব্দে এইচ হারাউয়ের এবং পি সিজপেস্টেইন এই প্যাপিরাসের লেখা প্রথম প্রকাশ করেন। প্যাপিরাসটি ছিন্ন অবস্থায় পাওয়ার কারণে পণ্ডিতদের বেশ কিছু তথ্য বুঝতে সমকালীন অন্যান্য প্রমাণেরও সাহায্য নিতে হয়েছে।

নানা বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে মোটামুটি সকলেই মেনে নিয়েছেন, কেরলের পওনম-ই ছিল প্রাচীন মুজিরিস। এই স্থান উৎখননে মুজিরিস প্যাপিরাস সমকালীন, বহু প্রত্ন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। প্যাপিরাসে উল্লেখিত চুক্তিটি হয় মুজিরিস নয়— আলেকজান্দ্রিয়ায়। প্রাচীন ইউরোপে ভারতীয় সামগ্রীর প্রভূত চাহিদা থাকায় আলেকজান্দ্রিয়ার এক বণিক হার্মাপোলন নামক এক জাহাজ মালিকের সঙ্গে একটি ঋণ চুক্তি করেন। প্যাপিরাসটি ছিন্ন অবস্থায় প্রাপ্তির কারণে উল্লেখিত দুই বণিকের নাম জানা যায় না। হার্মাপোলন জাহাজটির মুজিরিস থেকে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে ভারত মহাসাগর দিয়ে লোহিত সাগরে প্রবেশ করে, তৎকালীন মিশরের দুটি বিখ্যাত বন্দর বেরেনিকে অথবা ম্যায়স হারামস্-এর মধ্যে কোনো একটিতে পৌঁছাবার কথা ছিল। তারপর উল্লেখিত যে কোনো একটি বন্দর থেকে উটের স্বার্থবাহর মাধ্যমে এইসব সামগ্রী মিশরের কাপটোস মরুভূমির মধ্য দিয়ে নীলনদের নদীবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। এরপর নীলনদে বৃহৎ নৌকার মাধ্যমে এইসব সামগ্রী উজানে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল।

নিরাপদে ভারতীয় সামগ্রী আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছাবার জন্য দাদন গ্রহণকারীকে করমণ্ডল উপকূলের জলদস্যু, মধ্যপ্রাচ্যের বর্বর জাতির আক্রমণ বা কাপাটোস মরূভূমির ডাকাতদের প্রতিরোধের জন্য নিরাপত্তারক্ষীও নিযুক্ত করতে হতো। এছাড়া ওই বণিকের দায়িত্ব ছিল অর্থ এবং সামগ্রীর দ্বারা দেশে বিদেশে চুঙ্গি পরিশোধ করা। এরপরও কোনো কারণে বাণিজ্যিক সামগ্রী চুক্তি অনুসারে ঠিকমতো আলেকজান্দ্রিয়া না পৌঁছালে ঋণ গ্রহীতার দ্রব্যাদি বা জাহাজ বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ছিল ঋণদাতার।

পেরিপ্লুসের বর্ণনা অনুসারে এই সকল বাণিজ্যপোত ছিল অতিকায়। এই ধরনের জাহাজগুলির বর্ণনা আমরা সঙ্গম যুগের (তৃতীয় খৃঃ পূর্বাব্দ - চতুর্থ অব্দ) তামিল গাথায়ও দেখতে পাই। গ্রিক দার্শনিক ফিলস্ট্রাটুস (Philostratus, আনু. ১৭০/১৭২ - ২৪৭/২২০ অব্দ)-এর লেখা থেকে জানা যায়। গ্রিক পৌরাণিক রাজা ইরিধ্রাস-এর নিয়মানুসারে লোহিত সাগর দিয়ে ভারতে বাণিজ্য করতে কোনো যুদ্ধপোতই যেতে পারত না। একজন ব্যবসায়ীর অধীনে কেবল একটি বাণিজ্যপোতের একবার যাওয়ার অধিকার ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গ্রিক-রোমান আমদানি

সারণি - ২

সামগ্রী	ক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ (আমদানি শুল্কবিহীন)
কচ্ছপের খোল	৫১ টলেন্ট, ২১ মিনাই
তেজপাতা	১৮৬৩ টলেন্ট, ৫.৭৫ মিনাই
গোলমরিচ	১৩,২৪১ টলেন্ট, ৪৬.২৫ মিনাই
গাঙ্গেয় নালদ	৬০ বাক্স
পূর্ণাঙ্গ হাতির দাঁত	৭৮ টলেন্ট, ৫৪.৭৫ মিনাই
খণ্ডিত হাতির দাঁত	১৩ টলেন্ট, ৯.৭৫ মিনাই

সারণি - ৩

সামগ্রী	মোট ক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ (আমদানি শুল্কযুক্ত)
কচ্ছপের খোল	৬৮ টলেন্ট এবং ২৮ মিনাই + ২৫ শতাংশ কর ছাড়াও ৪/৩ পরিমাণ Subtracted quota।
তেজপাতা	২৪৮৪ টলেন্ট এবং ৮ মিনাই + ২৫ শতাংশ কর ছাড়াও ৪/৩ পরিমাণ Subtracted quota।
গোলমরিচ	১৭৭৪৪ টলেন্ট এবং ৫৯ মিনাই
গাঙ্গেয় নালদ	৮০ বাক্স
পূর্ণাঙ্গ হাতির দাঁত	১০৫ টলেন্ট এবং ১৩ মিনাই
খণ্ডিত হাতির দাঁত	১৭ টলেন্ট এবং ৩৩ মিনাই
সর্বমোট ওজন	২০,৪২০ টলেন্ট ২১ মিনাই + ৪/৩ পরিমাণ কচ্ছপের খোল ও তেজপাতার Subtracted quota + ৮০ বাক্স গাঙ্গেয় নালদ

কারকেরা বৃহৎ জাহাজই বাণিজ্যের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। লোহিত সাগরের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানের উৎখননে এই প্রকার জাহাজ তৈরির কাজে ব্যবহৃত ভারতীয় সেগুন কাঠ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা অবহিত নই গ্রিক রোমান বাণিকেরা সেই সেগুন কাঠের তৈরি জাহাজ ভারতে নির্মাণ করাতেন না জাহাজ নির্মাণের জন্য সেগুন কাঠ ভারত থেকে মিশরে নিয়ে যেতেন। তাছাড়া গোলমরিচ বা তেজপাতার মতো মশলা বেশি পরিমাণে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বৃহৎ পোতের প্রয়োজন ছিল। গ্রিক দার্শনিক স্ট্র্যাবো (৬৪ বা ৬৩ খৃঃ পূর্বাব্দ— আনু. ২৪ অব্দ)-র লেখা থেকে জানা যায়, লোহিত সাগর দিয়ে সমকালীন সময়ে গড়ে ১২০টি জাহাজ প্রতিবছর মুজিরিসে গমন করত।

এই মুজিরিস প্যাপিরাসে তিনটি রপ্তানিকৃত সামগ্রীর নাম আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। গাঙ্গেয় নালদ (Gargetic Nard), প্রথম শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ হাতির দাঁত (Sound Ivory) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খণ্ডিত হাতির দাঁত (Schidai)। গবেষকরা দীর্ঘ গবেষণা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ওই প্যাপিরাসের বহু অস্পষ্ট অংশই বর্তমানে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লিখিত তিনটি সারণিতে মুজিরিস প্যাপিরাসের বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১ রৌপ্য দ্রাখমা = ৪.৩ গ্রাম।

১ মিনা = ১.২৫ পাউণ্ড।

১ টলেন্ট (মিশরীয়) = ২৭ কিলোগ্রাম

মিনা এবং টলেন্ট কখনোই মুদ্রা হিসাবে নির্মিত হয়নি। প্রাচীন যুগে এগুলি গ্রিক-রোমক বাণিজ্যিক ওজন হিসাবেই সর্বদা ব্যবহৃত হয়েছে। (সারণি ১, ২ এবং ৩ দ্রষ্টব্য)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, হার্মাপোলন জাহাজের আমদানিজাত দ্রব্যের মোট ওজন মোটামুটি ২০,৫০০ টলেন্ট। এক টলেন্টকে যদি আমরা ৯৫ রোমক পাউন্ড ধরি, তাহলে ওই জাহাজে সর্বমোট সামগ্রীর পরিমাণ ছিল ৬২৫ টন, যার ৮৭ শতাংশই ছিল (৫৪৪ টন) গোলমরিচ।

মুজিরিস প্যাপিরাস নামক দলিলটি আমাদের সত্যিই চমৎকৃত করে। ভারত-প্রতীচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কের এই প্রাথমিক দলিল থেকে আমরা জানতে পারি, কী বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতীচ্যে বিভিন্ন সামগ্রী রপ্তানি করে ভারত লাভ করতো। মুজিরিস প্যাপিরাস (তমসুক) সেকথা প্রমাণেরই একমাত্র প্রাথমিক দলিল।

এই নশ্বর পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী হয় না। মহাকালের কালচক্রে একে একে বিলীন হয় সবকিছুই। তবুও এটাই আশ্চর্যের, এর পরেও কিছু কিছু বস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। এই দুটি তমসুকও সেই আশ্চর্যের অন্যতম নিদর্শন। আমরা প্রতীক্ষায় থাকবো, আগামী দিনে কালচক্রের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া আরও কিছু ছিন্ন তমসুকের খোঁজে। অপরাবিদ্যায় যার মূল্য অমূল্য।

প্রবন্ধ সূত্র :—

(1) History of Indian Theatre - M. L. Varadpande. (2) Rome's eastern trade : international commerce and imperial policy, 31BC - AD 305 -- Gary Keith Young. (3) The Indian ocean civilisation -- Arindam Mukherjee. (4) Catalogue of the Greek Papyri Vol. (I) Edited by Arthur S. Hunt.

প্রবন্ধ :—

(1) Playing Sudoku on the Verso of the 'Muziris Papyrus' : Pepper, Malabathrom and Tortoise Shell in the Gargo of the Hermapollan -- Fedrico De Romanis. (2) New Light on Maritime Loans : P. Vindeb. G 40822 -- L. Casson. (3) Ivory from Muziris -- Federico De Romanis.